অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
ভুতুড়ে ঘড়ি
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ভুতুড়ে ঘড়ি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: দেবশিস দেব

‘রা-স্বা’

ভাগিনেয়
শ্রীমান অমিত চক্রবর্তী
(ভোম্বল)
কল্যাণীয়েষু

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার
অষ্টপুরের বৃত্তান্ত
উঁহু
কিশোর উপন্যাস সমগ্র (১-৪)
কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড
গজাননের কৌটো
গোঁসাইবাগানের ভূত
গোলমেলে লোক
গৌরের কবচ
চক্রপুরের চক্করে
ছায়াময়
জং বাহাদুর সিংহর নাতি
ঝিকরগাছায় ঝঞ্ঝাট
ঝিলের ধারে বাড়ি
ডাকাতের ভাইপো
দশটি কিশোর উপন্যাস
দুধসায়রের দ্বীপ
নন্দীবাড়ির শাঁখ
নবাবগঞ্জের আগন্তুক
নবীগঞ্জের দৈত্য
নৃসিংহ রহস্য
পটাশগড়ের জঙ্গলে
পাগলা-সাহেবের কবর
পাতালঘর
বক্সার রতন
বটুকবুড়োর চশমা
বনি
বিপিনবাবুর বিপদ
ভোলু যখন রাজা হল
মদন তপাদারের বাক্স
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি
মোহন রায়ের বাঁশি
রাঘববাবুর বাড়ি
যোলো নম্বর ফটিক ঘোষ
সর্বনেশে ভুল অঙ্ক
সাধুবাবার লাঠি
সোনার মেডেল
হাবু ভুঁইমালির পুতুল
হিরের আংটি
হেতমগড়ের গুপ্তধন

দাদুর ঘড়ি চুরি গেছে। ব্যাপারটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। এই নিয়ে তাঁর মোট তিনশো বাইশটা ঘড়ি হয় চুরি গেছে, নয়তো হারিয়েছে, কিংবা নিজেই মেরামত করতে গিয়ে নষ্ট করেছেন। একবার কলকাতার রাধাবাজারে গলির গলি তস্য গলির মধ্যে এক ঘড়িওয়ালাকে দামি একটা ওমেগা সারাতে দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বছর তিনেক ধরে বহু ঘোরাঘুরি করেও সেই দোকানটা আর খুঁজে পাননি। এবারের ঘড়িটা গেল একটু অদ্ভুত উপায়ে। প্রায়ই ঘড়ি চুরি যায় বলে দাদু ঘড়িটাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন একটা ট্রানজিস্টার রেডিওর ভিতর। খুবই নিরাপদ জায়গা। রেডিওতে ব্যাটারির যে খোপ আছে তা থেকে ব্যাটারি বের করে নিয়ে ঘড়িটা ঢুকিয়ে ঢাকনা লাগালেই নিশ্চিন্ত। কেউ টেরই পাবে না ঘড়ি কোথায়। রেডিওটা জানালার পাশেই টেবিলের ওপর রাখা ছিল। চোর রাত্রিবেলা পাইপ বেয়ে উঠে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে রেডিও এবং আরও কিছু জিনিস নিয়ে গেছে। সকালে চেঁচামেচি। ঘড়িটা যে রেডিওর মধ্যে ছিল তা কেউ টের পায়নি, দাদুও সেকথা তোলেননি। তবে ঠাকুমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুব মুশকিল। তিনি সব দেখেশুনে হঠাৎ গিয়ে দাদুকে ধরলেন, "তোমার ঘড়ি কোথায়?"

দাদু প্রথমটায় আকাশ থেকে পড়ে বললেন, "ঘড়ি! ঘড়ি নিশ্চয়ই কোথাও আছে। নিশ্চয়ই চুরি যায়নি। নিশ্চয়ই খুঁজে পায়নি ব্যাটা।"

ঠাকুমা গম্ভীর গলায় বললেন, "তবে বের করো। দেখাও।"

দাদু মাথাটাথা চুলকে বললেন, "ঘড়িটাকে চুরির মধ্যে ধরা যায় না। চোর নিয়েছে রেডিওটা। সে তো আর ঘড়ি নিতে আসেনি। তবে চুরির মধ্যে পড়বে কী করে?"

"তার মানে কী? ঘড়ি কি তুমি রেডিওর মধ্যে রেখেছিলে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেটা চোরের জানা ছিল না। ফলে ঘড়িটা চুরি গেছে, এ কথাটা লজিক্যাল নয়।"

"রাখো তোমার লজিক। ফের ঘড়ি গেল, এটা নিয়ে কটা হারাল তা জানো?"

দাদু মিনমিন করে বললেন, "হারিয়েছে এমন কথাও বলা যায় যায় না। বরং বলা যেতে পরে ঘড়িটা নিখোঁজ।"

কিছুক্ষণ এই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড হল। দাদু কিন্তু বারবারই বললেন, "চুরি গেছে আসলে রেডিওটা। ঘড়িটা চোরের হাতে চলে গেছে বাই চান্স। ক্রেডিটটা চোরকে দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?"।

তবু যাই হোক তিনশো বাইশতম ঘড়িটা হারিয়ে দাদুকে একটু লজ্জিতই মনে হল। বেশি কথা-টথা বলছিলেন না। তিনি ঘড়ি ধরে ওঠেন বসেন, সুতরাং ঘড়ি ছাড়া তাঁর চলেও না। ঘড়ির কথাটা আস্তে-আস্তে চাপা পড়ে গেল সারাদিনের নানা কাজে।

বিকেলের দিকে দাদুর বাল্যবন্ধু তান্ত্রিক শ্যামাচরণ আসায় কথাটা ফের উঠল। শ্যামাচরণের সঙ্গে দাদুর বন্ধুত্ব কী রকম তা লাটু, কদম বা ছানু জানে না। তবে তারা দেখে জটাইদাদু এলেই তাদের দাদুর সঙ্গে ঝগড়া লাগে। তারা প্রায়ই পড়াশুনো ফেলে রেখে ঝগড়া শোনে।

দাদু হয়তো হঠাৎ বলে বসলেন, "ক্লাস এইট-এ ফেল করে তো সাধু হয়েছিলে। সব জানি। বেশি যোগ-ফোগ আর তন্ত্র-মন্ত্র আমাকে দেখাতে এসো না। যোগের তুমি জানো কী হে? যোগ কথাটার মানে জানো?"

জটাইদাদু তাঁর বিশাল জটাসুদ্ধ মাথাটা সামান্য নাড়েন আর মৃদু-মৃদু হাসেন। খুব ঠাণ্ডা ভদ্র গলায় বলেন, "মানে বললেই কি আর তুমি বুঝবে? বস্তুর সাধনা করে করে তো বোধশক্তিটাই হয়ে গেছে বস্তুতান্ত্রিক। যোগ মানে হল আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ। কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে সহস্রারের যোগ। রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের..."

"বুঝেছি! এক আজগুবির সঙ্গে আর এক আজগুবির যোগ! একটা মিথ্যের সঙ্গে আর একটা মিথ্যের যোগ। একটা পাগলামির সঙ্গে আর এক পাগলামির যোগ। বলি, এসব গুলগপ্পো আর কতদিন চলবে? বুড়ো হয়ে মরতে চলেছ, এখন আর মিথ্যে কথা না বাড়িয়ে সত্যি কথাটা বলেই ফেল না। বলেই ফেল যে, ভগবান-ফগবান কিচ্ছু নেই। স্রেফ গাঁজাখুরি গল্প। বলি যোগ-যোগ যে করছ, ভগবান দেখেছ নিজের চোখে?"

জটাইদাদু তবু অমায়িক হাসেন আর মড়ার খুলিতে চা খেতে খেতে মাথা নাড়েন। মড়ার খুলি ছাড়া জটাইদাদু চা বা জল খান না। প্রথমদিন যখন ঝোলা থেকে করোটি বের করে কাপের চা ঢেলে নিলেন সেদিন, ঠাকুমা কেঁপে-ঝেঁপে অস্থির হয়ে বলে ফেলেছিলেন, "ঠাকুরপো, এ হল বামুনবাড়ি, ওসব মড়াটড়ার ছোঁয়া কি ভাল? সব অশুদ্ধ হয়ে যাবে যে!" জটাইদাদু খুব হেসে উঠে বললেন, "বলেন কী বউঠান! করোটি অশুদ্ধ হলে আমার সাধনাও যে অশুদ্ধ। আমাদের যে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে সাধনা করতে হয়। আর এ হচ্ছে হরি ডোমের করোটি। সে ছিল মস্ত সাধক। অমাবস্যায় নিশুত রাত্তিরে এই খুলি জাগ্রত হয়ে ওঠে, কথা নয়।" একথা শুনে ঠাকুমা বাক্যহারা হয়ে গেলেন। তারপর আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করেননি।

ঘড়ি চুরির পরদিন সন্ধেবেলাও জটাইদাদু এসেছেন এবং তাঁকে যথারীতি করোটিতে চা ঢেলে দেওয়া হয়েছে। লাটু, কদম আর ছানু পড়ার ঘরে পড়া থামিয়ে কান খাড়া করে আছে।

কিন্তু দাদু যেন আজ একটু মনমরা। জটাইদাদুকে দেখেও খেঁকিয়ে উঠলেন না। বরং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ওহে, ইয়ে, তোমাদের তন্ত্র-মন্ত্রে নিরুদ্দিষ্ট জিনিস খুঁজে পাওয়ার কোনও ব্যবস্থা আছে?"

জটাইদাদু মৃদু হেসে বললেন, "থাকবে না কেন? তন্ত্রসাধনায় সবই হয়।"

"ইয়ে, কাল রাত থেকে আমার ঘড়িটা নিখোঁজ।" দাদু চাপা স্বরে বললেন।

"নিখোঁজ? চুরি নাকি?"

দাদু মাথা নেড়ে বলেন, "না, চুরি নয়। চুরি তো হয়েছে রেডিওটা।"

"ওঃ তাই বলো! রেডিও! তা এতক্ষণ 'ঘড়ি ঘড়ি' করছিলে কেন?"

দাদু তখন ঘটনাটা ব্যাখ্যা করলেন। জটাইদাদু নিমীলিত নয়নে হরি ডোমের করোটিতে চা খেতে খেতে সব শুনে বললেন, "এ অভ্যাস তোমার ছেলেবেলা থেকেই। ক্লাসে প্রায়ই তোমার পেনসিল হারাত। আমার মনে আছে।"

দাদু গম্ভীর হয়ে বললেন, "আজকাল আমি মোটেই পেনসিল হারাই না। বাড়ির লোককে জিজ্ঞেস করতে পারো। এই লাটু, কদম, ছানু, তোরাই বল তো, আমি আজকাল পেনসিল হারাই?"

তিনজন সমস্বরে বলে ওঠে, "না তো! দাদু তো এখন কেবল ঘড়ি, বাঁধানো দাঁত, চশমা আর চটিজুতো হারায়।"

এমন সময় ঠাকুমা ঘরে ঢুকে বলে ওঠেন, "পেনসিলের কাজ থাকলে তাও হারাত। আচ্ছা, তোমার কি আক্কেল হয় না?"

জটাইদাদু অবিচল কণ্ঠে বললেন, "ঠিকই বলেছেন বউঠান, হারাতে হারাতে হারান যে আমাদের বুড়ো হতে চলল, তবু বুঝল না ঈশ্বরপ্রেমে আত্মহারা হলে এত কিছু হারাতই না ওর। হারান রে, আত্মহারা হ, আত্মহারা হ।"

এইভাবেই আবার একটা তুলকালাম বেধে উঠল।

দাদু অর্থাৎ হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিন ছেলে। সত্যগুণহরি, রজোগুণহরি এবং বহুগুণহরি। বলা বাহুল্য, ছেলেদের নামকরণ হারানচন্দ্রের নয়। তিনি ঘোর নাস্তিক। তবে তাঁর বাবা হরিভক্ত ছিলেন। তাঁর নামও ছিল হরিভক্ত চট্টোপাধ্যায়। নাতিদের নামকরণ তিনিই করে যান, এবং পাছে তিনি মারা গেলে নাতিরা নাম পাল্টে ফেলে সেই ভয়ে একেবারে ইশকুলের খাতায় নাম তুলে দিয়ে তবে মরেছেন। বড় ছেলে সত্যগুণের দুই ছেলে লাটু আর কদম এবং এক মেয়ে ছানু। রজোগুণ ও বহুগুণ বিয়ে করেননি।

সত্যগুণ কলকাতায় থেকে চাকরি করেন। শনিবার বাড়ি আসেন। সোমবার ফিরে যান। হারানবাবুর ঘড়ি চুরির খবর পেয়ে এক শনিবার তিনি কলকাতা থেকে একটা ঘড়ি কিনে আনলেন।

ঘড়ি দেখে হারানচন্দ্র ভারী লাজুক হেসে বললেন, "আবার ঘড়ি কেন? আমি ভাবছিলাম আর ঘড়িটড়ি ব্যবহারই করব না। তা এটা কেমন ঘড়ি।"

সত্যগুণ মাথা চুলকে বললেন, "ভালই হওয়ার কথা। আমার এক চেনা লোক দিয়েছে। শক্‌প্রুফ, ওয়াটারপ্রুফ, অটোমেটিক।"

"বটে! ওরে, এক গামলা জল নিয়ে আয় তো!" হারানচন্দ্র হাঁক দিলেন।

কোনও জিনিস পরীক্ষা না করে হারানচন্দ্রের শান্তি নেই। চাকর এক গামলা জল দিয়ে গেল। হারানচন্দ্র ঘড়িটা তাতে ডুবিয়ে দশ মিনিট অপেক্ষা করে তারপর তুললেন। না, জল ঢোকেনি। এর পর হাত তিনেক ওপর থেকে ঘড়িটা মেঝেয় ফেললেন, না, ভাঙল না।

হারানচন্দ্র খুশি হয়ে বললেন, "ভালই মনে হচ্ছে। তবে এ ঘড়ির দেখছি অনেক ঘর। সাধারণ ঘড়ির মতো বারোটা নয় তো!"

সত্যগুণ দুরুদুরু বক্ষে ঘড়ির ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষণ করছিলেন। এবার তাড়াতাড়ি বললেন, "হ্যাঁ, ওইটাই এ ঘড়ির বিশেষত্ব। দিনের চব্বিশ ঘণ্টার হিসেবে ওতেও চব্বিশটা ঘর। নতুন ধরনের করেছে আর কি!"

হারানচন্দ্র ভ্রূ কুঁচকে ঘড়িটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, "এর ডায়ালের ওপর আরও তিনটে ছোট ছোট ডায়াল আছে। দেখতে পাচ্ছি। ওগুলো কী?"

সত্যগুণ বললেন, "সব আমি জানি না। ঘড়িটা এদেশে নতুন এসেছে। খুব আধুনিক ব্যাপার-স্যাপার আছে ওতে। পরেরবার জেনে আসব।"

ঠাকুমা বাসবনলিনী দেবী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঝংকার দিয়ে বললেন, "তা এটা কবে চোরের ঘরে যাচ্ছে সেটাই হিসেব করো। আমি বলি কী, ঘড়ি একটা ওঁকে জলের সঙ্গে বড়ির মতো গিলিয়ে দে। পেটে

গিয়ে টিকটিক করুক। চুরিও যাবে না।"

এইসময়ে জটাই তান্ত্রিক ঘরে ঢুকে নির্নিমেষ লোচনে বাল্যবন্ধুর হাতে ঘড়িটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "তিনশো তেইশ নম্বরটা এল বুঝি! ভাল। কিন্তু একটু সবুর করলে চুরি যাওয়া তিনশো বাইশ নম্বরটাও পাওয়া যেত হে। সেটার খোঁজে বাঞ্ছারামকে লাগিয়েছি।"

হারানবাবু অবাক হয়ে বলেন, "বাঞ্ছারামটি আবার কে?"

"আছে হে আছে। চিনবে। ভারী চটপটে, ভারী কেজো। বস্তুবাদীরা তাকে চোখে দেখতে পায় না বটে, কিন্তু সে জাজ্বল্যমান হয়েই ঘুরে বেড়ায়।"

হারানচন্দ্র চটে উঠে বলেন, "গুলগপ্পোর আর জায়গা পাওনি! আমাকে ভূত দেখাতে এসেছ? ঠিক আছে, বের করো তোমার বাঞ্ছারামকে। বের করো।"

জটাই তান্ত্রিক দাড়ির ফাঁক দিয়ে সদাশয়ের মতো হেসে বললেন, "বের করলেই যে ভিরমি খাবে। তার দরকারই বা কী? ঘড়ি পেলেই তো হল।"

"বেশ, তবে বের করো ঘড়ি।"

"আহা, অমন তাড়া দিলে কি চলে? ঘড়ি ঠিক আসবে। কিন্তু আমি বলি, এত ঘড়ি কিনলে আর হারালে, তবু কি তোমার সময়ের জ্ঞানটা হয়েছে হারান? আয়ু যে ফুরিয়ে এল সেটা খেয়াল করছ? পরকালের কাজ বলে কি কিছু নেই? এইসব ছেলেখেলা নিয়ে ভুলে থাকলেই চলবে?"

হারানচন্দ্র বিষাক্ত হাসি হেসে বললেন, "পরকালের তত্ত্ব তোমার মতো ক্লাস এইট-এ লাড্ডু পাওয়া গবেটের কাছে জানতে হবে নাকি? যত্ত সব গুলবাজ, গাঁজাখোর, ধর্মব্যবসায়ী!"

বাসবনলিনী শিহরিত হয়ে ধমক দিলেন, "ছিঃ ছিঃ, ঠাকুরপোকে ওরকম করে বলতে আছে? তোমার যে কবে কাণ্ডজ্ঞান হবে! ছোটরা শুনছে না?"

হারানচন্দ্র স্তিমিত হয়ে বলেন, "তা ও ওরকম বলে কেন?"

জটাই তান্ত্রিক করোটিটা ঝোলা থেকে বের করে টেবিলে রেখে বলেন, "আহা, বলুক, বলুক বৌঠান। মরা মরা বলতে বলতে যদি কোনওদিন রামনাম ফুটে ওঠে।"

হারানচন্দ্র রাত্রে ঘড়িটা বালিশের তলায় নিয়ে শুলেন।

মাঝরাতে হঠাৎ তিনি চেঁচামেচি করে উঠলেন, "এই, শিগগির রেডিওটা বন্ধ কর। এত রাত্রে রেডিও শুনছে কে রে? অ্যাঁ!"

হারানচন্দ্রের বাজখাঁই গলার চিৎকারে বাড়িসুদ্ধু লোক উঠে পড়ে। কে রেডিও চালাচ্ছে তার খোঁজ শুরু হয়ে যায়।

বাসবনলিনী উঠে সবাইকে ধমক দিয়ে বলেন, "তোদের কি মাথা খারাপ হল নাকি যে, ওঁর কথায় কান দিচ্ছিস! রেডিও কোথায় যে বাজবে? রেডিও চুরি হয়ে গেছে না?"

তখন সকলের খেয়াল হল। তাই তো! বাড়িতে রেডিওই নেই যে!

হারানচন্দ্র আমতা-আমতা করে বলেন, "কিন্তু আমি যে স্পষ্ট শুনেছি। রেডিওতে গান হচ্ছে। কথাবার্তা হচ্ছে। "

বাসবনলিনী রাগ করে বলেন, "এত রাত্রে রেডিওতে গানবাজনা হয় বলে শুনেছ? রেডিওর লোকেদের কি ঘুম নেই?"

তাও বটে। হারানচন্দ্র বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করে দেখলেন। তারপরই আঁতকে উঠে বললেন, "এ কী? এ যে দেখছি ভোর হয়ে গেছে। সকাল ছটা বাজে যে! না, না, আটটা, নাকি...দূর ছাই, এ ঘড়ির যে কিছুই বোঝা যায় না!"

বাসবনলিনী উদার গলায় বললেন, "আর কষ্ট করে ঘড়ি দেখতে হবে না। আমি একটু আগেই দেয়াল-ঘড়িতে রাত দুটোর ঘণ্টা শুনেছি। এখন দয়া করে ঘুমোও।"

লজ্জা পেয়ে হারানচন্দ্র ঘুমোলেন। কিন্তু একটু পরেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। খুব কাছেই যেন কারা চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে। ভাষাটা একটু বিচিত্র।

হারানচন্দ্র চোর এসেছে বুঝতে পেরে তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন, "চোর! চোর! পাকড়ো!"

আবার বাড়িসুদ্ধু লোক উঠে ছোটাছুটি দৌড়োদৌড়ি শুরু করল। কিন্তু চোরের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। বন্ধ দরজা বা জানালার শিক সব অক্ষত আছে। খাটের তলা বা পাটাতনেও কেউ লুকিয়ে নেই।

হারানচন্দ্র মাথা চুলকে বললেন, "একজন নয়। কয়েকজন চোর এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন আবার মেয়েছেলে। আমি স্পষ্ট তাদের কথা শুনেছি।"

বাসবনলিনী চোখ পাকিয়ে বললেন, "কী বলছিল তারা শুনি!"

"কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না। ভাষাটা অন্যরকম।"

"জন্মে শুনিনি যে, চোরে চুরি করতে এসে কথা বলে। তোমার আজ হয়েছে কী বলো তো! এই রেডিওর শব্দ শুনছ, এই চোরের কথাবার্তা শুনছ! বলি লোককে ঘুমোতে দেবে, না কী?"

হারানচন্দ্র ধমক খেয়ে আবার শুলেন। কিন্তু ঘুম এল না। চোখ বুজে নানা কথা ভাবছেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন, কাক ডাকছে, কোকিল ডাকছে, শাঁখ বাজছে। চমকে উঠে বসলেন। তবে এবার আর চেঁচামেচি করলেন না তাঁর মনে হল, বাস্তবিক তিনি স্বপ্নই দেখছেন বোধহয়। কারণ, কাক ডাকার কোনও কারণ নেই। ভোর হতে বিস্তর বাকি। বাইরে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার।

হারানচন্দ্র বসে বসে ভাবতে লাগলেন, এসব হচ্ছেটা কী? তিনি যা শুনছেন তা মিথ্যে নয়। অথচ আর কেউ শুনছে না। কেন? ভাবতে ভাবতে বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করে হাতে পরলেন, তারপর বিছানা থেকে নেমে বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আরও ভাবতে লাগলেন।

আচমকা একটা মেয়ে খুব কাছেই কোথাও খিলখিল করে হেসে উঠল। হারানচন্দ্র চমকে উঠে চারদিকে তাকালেন। কেউ নেই। থাকার কথাও নয়। হাসির শব্দটা ঠিক স্বাভাবিক নয়, একটা ধাতব শব্দ। যেমন লাউডস্পিকার বা রেডিওতে শোনা যায়। হারানচন্দ্র উঠে চারদিকটা ঘুরে এলেন। না, কেউ কোথাও নেই। এসে আবার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেই তাঁর একটা খটকা লাগল। এই যে তিনি বাড়ির ভিতরে চারদিক ঘুরে এলেন, কিন্তু তিনি তো আলো জ্বালাননি। ঘরগুলো তো অন্ধকার। আলো না জ্বালিয়েও তিনি সবই দেখতে পেয়েছেন। এটা কী করে সম্ভব হল?

নাঃ, আজ মাথাটা বড্ড গরম হয়েছে। একবার তাঁর এও মনে হল, জটাই তান্ত্রিককে অত গালাগালি রোজ করেন বলেই বোধহয় তান্ত্রিকের পোষা ভূতেরা এসে এসব কাণ্ড করছে। কাল সকালেই একবার জটাইয়ের কাছে যেতে হবে। হারানচন্দ্র ভূত বা ভগবান মানেন না বটে, কিন্তু এখন কেমন যেন একটা সন্দেহ হচ্ছে। গা ছমছম করছে।

ভোরের দিকটায় হারানচন্দ্র ইজিচেয়ারে শুয়েই একটু ঘুমোলেন। ঘুম ভাঙল আবছা আলো ফুটে ওঠার পর।

সূর্যোদয়ের আগেই সাধুদের প্রাতঃকৃত্য, জপতপ সব শেষ করতে হয়। জটাই তান্ত্রিক সব সেরে তাঁর সাধনপীঠের উঠোনে বসে হরি ডোমের করোটিতে করে চা খাচ্ছিলেন। হারানচন্দ্রকে আগড় ঠেলে ঢুকতে দেখে খুব একটা অবাক হলেন না। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে হারানচন্দ্র প্রায়ই তাঁর কাছে এসে বসেন এবং তন্ত্রসাধনা ও ধর্ম ইত্যাদির অসারতা প্রমাণ করে উঠে যান।

আজ হারানচন্দ্রকে একটু কাহিল দেখাচ্ছিল। কণ্ঠস্বরটা তেমন তেজী নয়। একটা মোড়া টেনে বসে বারকয়েক গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "ওহে, ইয়ে, কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি।"

জটাই তান্ত্রিক মুখ থেকে করোটিটা নামিয়ে বললেন, "ঘুম হয়নি মানে? তুমি কি এখনও জেগে আছ নাকি?"

"জেগে নেই?" বলে আতঙ্কিত হারানচন্দ্র নিজের গায়ে নিজেই একটা চিমটি কেটে "উঃ" করে ককিয়ে ওঠেন।

জটাই তান্ত্রিক উদার হাস্যে মুখখানা ভাসিয়ে বলেন, "না, না, তোমার দেহের ঘুম ভেঙেছে বটে হে হারান, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আত্মার ঘুম! তাকে জাগাবে কবে? সে যদি না জাগল, তবে আর জাগ্রত আছ বলি কী করে?"

হারানচন্দ্র চিমটির জায়গাটায় হাত বোলাতে বোলাতে খেঁকিয়ে উঠলেন, "তোমার কবে আক্কেল হবে বলো তো! সকালবেলাতেই এমন সব কথা বলো যে পিত্তি জ্বলে যায়। একে কাল রাতে ঘুম হয়নি, মাথাটা কেমন টলমল করছে।"

জটাই তান্ত্রিক করোটিটা গঙ্গাজলে ধুয়ে তুলে রাখলেন। তারপর আচমন করে রক্তাম্বরে মুখ মুছে বললেন, "ঘুম হয়নি কেন?"

"ইয়ে, রাত্রে মনে হয় চোর এসেছিল।"

"আবার চোর?"

হারানচন্দ্র প্রথমেই ভূতের কথাটা তুলতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। তাই ভাবছিলেন একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা তুলবেন। এবার বললেন, "চোর বলেই মনে হয়েছিল। আমি তাদের কথাবার্তা শুনেছি, গানবাজনাও। কিন্তু..."

জটাই তান্ত্রিক খুব অবাক হয়ে বলেন, "চোর তোমার বাড়িতে এসে গানবাজনা করেছে? বলো কী?"

হারানচন্দ্র লজ্জিত হয়ে বলেন, "সেখানেই গোলমাল। চোর গানবাজনা করতে গেরস্তবাড়িতে ঢোকে না। তারা হাসেও না। কিন্তু কাল রাতে এ-সবই ঘটেছে। আমি ছাড়া অবশ্য আর কেউ কিছু শোনেনি। তাই ভাবছিলাম এসব ইয়ে নয় তো! সেই যে কী যেন বললা তোমরা!"

জটাই তান্ত্রিক বাল্যবন্ধুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, "কিসের কথা বলছ বলো তো?"

"ইয়ে, মানে ওইসব আর কি! ওই যে তুমি যাদের দিয়ে তোমার বুজরুকিগুলো করাও। তাই ভাবছিলাম ব্যাপারটা তোমাকে বলি।"

জটাই তান্ত্রিক মাথা নেড়ে বলেন, "বুজরুকি আমি কখনও করিনি। কী জিনিস তাও জানি না। কাল রাতে কি তোমার বাড়িতে কোনও ভৌতিক ঘটনা ঘটেছে?"

"ইয়ে, অনেকটা তাই। তবে আমি ওসব বিশ্বাস করি না তা আগেই বলে রাখছি। "

জটাই তান্ত্রিক গম্ভীর হয়ে বলেন, "খুলে বলো।"

হারানচন্দ্র বললেন। জটাই তান্ত্রিক ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে চুপ করে বসে শুনলেন।

বলা শেষ হলে জটাই তান্ত্রিক একটা বিশাল শ্বাস ফেলে বললেন, "বুঝেছি।"

"কী বুঝলে?"

"ব্যাপারটা খুব সহজ নয় হে হারান।"

হারান মুখ ভেংচে বললেন, "সহজ নয় হে হারান! খুব বললে! এতকাল জপতপের ভণ্ডামি করে এখন 'সহজ নয় হে হারান' বলবে, এটা শোনার জন্য তো তোমার কাছে আসিনি! বলি, কিছু বুঝেছ ব্যাপারটা?"

"বুঝেছি।"

"ছাই বুঝেছ! কী বলো তো?"

জটাই তান্ত্রিক গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঘড়ি।"

"ঘড়ি? তার মানে?"

"তোমার ওই নতুন ঘড়িটা গো। ওটাই যত নষ্টের মূল।"

হারানচন্দ্র তাড়াতাড়ি হাতঘড়িটার দিকে তাকালেন। ঘড়িটা একটু অস্বাভাবিক বটে। এখনও পর্যন্ত তিনি ঘড়ি দেখে সময় আঁচ করতে পারেননি। কাঁটা দুটো কখন যে কোন ঘরে থাকবে, তার কোনও স্থিরতা নেই। এইসব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি তাঁর পছন্দ নয়। সাবেকি জিনিস অনেক ভাল।

তিনি বললেন, "ঘড়ির সঙ্গে এসব ঘটনার কী সম্পর্ক? কী যে সব পাগলের মতো কথা বলো।"

জটাই তান্ত্রিক গম্ভীর হয়ে বললেন, "এর আগে কোনওদিন এরকম ঘটনা ঘটেছে?"

"না।"

"ঘড়িটা আসার পরেই কেন ঘটল তা ভেবে দেখেছ?"

"ভাববার সময় পেলাম কোথায়?"

"আমার কিন্তু ভাবা হয়ে গেছে।"

"কী বুঝলে ভেবে?"

"বুঝলাম যে, ঘড়িটা নতুন নয়। নিশ্চয়ই এর আগে ঘড়িটার একজন মালিক ছিল। কোনও কারণে সেই মালিকের মৃত্যু ঘটেছে। এবং সে ঘড়ির মায়া এখনও কাটাতে পারেনি। আত্মাটা ঘড়ির কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে। কাল রাতে তুমি যে-সব শব্দ শুনেছ, তা সম্পূর্ণ ভৌতিক।"

হারানচন্দ্র বেকুবের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে খেঁকিয়ে উঠতে গিয়েও পারলেন না। কথাটা তাঁর অযৌক্তিক মনে হচ্ছে না তো! ঘড়িটা ভাল করে আবার দেখলেন তিনি। সাধারণ কব্জিঘড়ির মতোই, একটু হয়তো বা বড়। ঝকমকে স্টেনলেস স্টিলের। পুরনো নয় বটে, তবে সেকেন্ডহ্যান্ড হতে বাধা নেই। এসব জিনিস তো বহুকাল নতুনের মতোই থাকে!

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "ইয়ে, ওসব আমি মানছি না কিন্তু। মানে ভূতটুত আমি বিশ্বাস করছি না। তবে যদি ওসব ইয়ে থেকেই থাকে, তবে তোমাদের তন্ত্রেমন্ত্রে কোনও বিধান নেই?"

জটাই তান্ত্রিক হাত বাড়িয়ে বললেন, "ঘড়িটা দাও দেখি।"

হারানচন্দ্র ঘড়িটা হাত থেকে খুলে দিলেন। জটাই তান্ত্রিক সেটা অনেকক্ষণ হাতের মুঠোয় ধরে ধ্যানস্থ থাকলেন। তারপর খুব দূরাগত স্বরে বলতে লাগলেন, "টবিন সাহেব...বেঁটেখাটো, ভারী জোয়ান...মুখটা দেখলেই মনে হয় খুনি...লন্ডনের সোহো এলাকার একটা গলি ধরে দৌড়োচ্ছে...মধ্যরাত্রি...পিছনে একটা কালো গাড়ি আসছে...টবিন চৌমাথায় পৌঁছে গেছে...পিছন থেকে গুড়ুম করে গুলির শব্দ...টবিন মাটিতে বসে পড়ল...গুলি লাগেনি...সামনেই একটা ট্যাক্সি...টবিন এক লাফে উঠে পড়ল...কালো গাড়ি থেকে আবার গুলি...ট্যাক্সিটা জোরে যাচ্ছে...জাহাজঘাটা...একটা জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে...ডেক থেকে টবিন ঝুঁকে চারদিকে লক্ষ রাখছে...হাতে ঘড়ি...এই ঘড়িটা...জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগর পার হচ্ছে...রাত্রি... টবিনের কেবিনের দরজা আস্তে খুলে গেল...কে...গুড়ুম...গুড়ুম..."

হারানচন্দ্র হাঁ করে জটাই তান্ত্রিকের মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

জটাই চোখ খুলে বললেন, "জলের মতো পরিষ্কার। এ হচ্ছে টবিনের ঘড়ি..."

"টবিন কে?"

"একটা খুনি, গুণ্ডা, ডাকাত।"

“তুমি জানলে কী করে?”

“ধ্যানযোগে।”

হারানচন্দ্র রেগে উঠতে গিয়েও পারলেন না। কে জানে বাবা, সত্যি হতেও পারে। বললেন, “টবিন কি খুন হয়েছে নাকি?”

“তবে আর বলছি কী? তার আত্মা ঘড়িটার সঙ্গে লেগে আছে।”

“তুমি দেখতে পাচ্ছ?”

“পরিষ্কার। তবে দেখার জন্য আলাদা চোখ চাই।”

“ঘড়িটা কি তাহলে ফেরত দেব?”

জটাই তান্ত্রিক একগাল হেসে বলেন, “আমি থাকতে তুমি ভূতের ভয়ে ঘড়ি ফেরত দেবে? পাগল নাকি! ঘড়িটা আমার কাছে এখন থাক। শোধন করে দিয়ে আসব’খন। “

হারানচন্দ্র সম্মতি প্রকাশ করে উঠে পড়লেন। তারপর বললেন, “ইয়ে, বাড়িতে এ নিয়ে কিছু বোলো না।”

“আরে না। নিশ্চিন্ত থাকো।”

হারানচন্দ্র বিরস মুখে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়ি ফিরতেই একটা শোরগোল উঠল। লাটু, কদম আর ছানু এসে দাদুকে একটু দেখে নিয়েই ছুটল ঠাকুমাকে খবর দিতে, “ও ঠাকুমা! দাদুর হাতে ঘড়ি নেই।”

“আবার হারিয়েছ?” বলে হুংকার দিয়ে বাসবনলিনী ধেয়ে এলেন।

ঘড়ি হারায়নি। জটাই তান্ত্রিকের কাছে শোধন করতে দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সে-কথা স্বীকার করেন কী করে? বাড়ির সবাইকে এতকাল তিনি নিজেই বুঝিয়ে এসেছেন যে, তিনি ঘোরতর নাস্তিক, তন্ত্রমন্ত্র ঈশ্বর কিছুই মানেন না। হারানচন্দ্র আমতা-আমতা করে বললেন, “হারায়নি। হারাবে কেন?”

“তাহলে ঘড়ি কোথায়?”

“কোথাও আছে এখানে সেখানে।”

“তুমি ঘড়ি হাতে দিয়ে বেরোওনি?”

হারানচন্দ্র ফাঁপরে পড়ে বলেন, “ইয়ে, ঘড়িটা আমি সারাতে দিয়েছি।”

“সারাতে দিয়েছ! নতুন ঘড়ি যে!”

“নতুন নয়। সত্যকে নতুন বলে গছিয়েছে। আসলে সেকেন্ডহ্যান্ড। একটু গোলমাল করছিল।”

“কার কাছে সারাতে দিলে?”

“আমার এক বন্ধুর কাছে।” বলে হারানচন্দ্র একটা নিশ্চিন্দির শ্বাস ছাড়লেন। কথাটা খুব মিথ্যেও বলা হল না। শোধন করা মানে তো একরকম সারানোই।

তবে বাসবনলিনীকে ঠকানো মুশকিল। চোখ বড় বড় করে হারানচন্দ্রের দিকে খানিকক্ষণ রক্ত-জল-করা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার আবার ঘড়ির মিস্ত্রি বন্ধু কে আছে? সবাইকেই তো চিনি।”

হারানচন্দ্র বিপন্ন হয়ে বলেন, “আছে আছে। সবাইকে তুমি চিনবে কী করে?”

বাসবনলিনী তর্ক করলেন না। আরও কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চাপা স্বরে বললেন, "বুড়ো বয়সে আর কত মিথ্যে কথা বলবে? সত্যি কথাটা বললেই তো হয় যে, ঘড়িটা আবার হারিয়েছ। আনকোরা নতুন ঘড়িটা হারালে, তার ওপর ছেলের বদনাম করে বলে বেড়াচ্ছ যে, ঘড়িটা সেকেন্ডহ্যান্ড ছিল! ছিঃ ছিঃ!"

হারানচন্দ্র মরমে মরে গেলেন। কিন্তু কিছু করারও নেই।

কথাটা রাষ্ট্র হতে দেরি হল না। সবাই জানল, হারানচন্দ্র আবার ঘড়ি হারিয়েছেন। হারানচন্দ্র অবশ্য স্বীকার করলেন না। কেবল বলতে লাগলেন, "ঠিক আছে। সারিয়ে আনি আগে, তারপর দেখো।"

হারানচন্দ্রের মেজ ছেলে রজোগুণহরির শখ হল ফোটোগ্রাফির। গোটাকয়েক ক্যামেরা আছে তার। দিনরাত ফোটোগ্রাফি নিয়েই তার যত চিন্তাভাবনা। গোটা গঞ্জের যাবতীয় মানুষের ছবি তার তোলা হয়ে গেছে। কুকুর, বাঁদর, বেড়াল, পাখি, ফড়িং, পোকামাকড়ও বড় একটা বাদ নেই। প্রতিদিনই সে ছবি তুলছে। নিজেরই একটা ডার্করুম আছে তার। সেখানে ফিল্ম ডেভেলপ আর প্রিন্টিং-এর ব্যবস্থা আছে। নানা পত্রপত্রিকায় সে ছবি পাঠায়। বেশির ভাগই ছাপা হয় না। চাঁদের আলোয় কাশফুল, মেঘের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মুখ, সাপের ব্যাং ধরা, বাঁদরের অপত্যস্নেহ ইত্যাদি অনেক ছবি তুলে গঞ্জে বেশ বিখ্যাত হয়েছে রজোগুণ।

রজোগুণের লাইকা ক্যামেরায় শেষ দু'তিনটে শট বাকি ছিল। তাই আজ খুব ভোরে উঠে সে একটা কাকের ব্রেকফাস্টের ছবি তুলেছে। কাকটা তেতলা ছাদের রেলিঙে বসে এঁটোকাঁটা কিছু খাচ্ছিল। বাবা ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমোচ্ছ, হাতে ঘড়ি, এই ছবিটাও তুলে ফেলল সে। বাগানে একটা প্রজাপতির ছবি তুলতেই ফিল্ম শেষ হয়ে গেল।

দুপুর নাগাদ ফিল্ম ডেভেলপ করার পর শেষ তিনটে নেগেটিভ দেখে সে তাজ্জব হয়ে গেল। আশ্চর্য! এ কী! তিনটে ছবির একটাও ওঠেনি। একদম সাদা। এরকম হওয়ার তো কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, দু'নম্বর ছবিটা। এটা হারানচন্দ্রের ঘুমন্ত অবস্থার ছবি। এ ছবিতে আর সব সাদা হলেও ঘড়িটার ছবি কিন্তু ঠিকই উঠেছে। রজোগুণের বেশ মনে আছে, তার বাবার বাঁ হাতখানা ছিল পেটের ওপর। ঘড়িটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ভিউ ফাইন্ডারে। ছবিতে ঘড়িটা উঠেছে মাঝামাঝি জায়গায়। কিন্তু হারানচন্দ্র বিলকুল গায়েব!

রজোগুণ ক্যামেরাটা ভাল করে পরীক্ষা করল। না, কোনও গোলমাল নেই তো!

রজোগুণ বসে-বসে কাণ্ডটা কী হল তা ভাবছে, এমন সময় বহুগুণ এসে হানা দিল।

"মেজদা, তোমার ঘড়িটা একটু দেবে? আমার ঘড়িটা সকাল থেকেই গোলমাল করছে।"

রজোগুণ অন্যমনস্কভাবে বলল, "টেবিলে আছে, নিয়ে যা।"

বহুগুণ ঘড়িটা নিয়ে একটু দেখেই চেঁচিয়ে ওঠে, "আরে! তোমারটাও যে উলটো চলছে!"

"তার মানে?"

"সকাল থেকেই আমার ঘড়ির কাঁটা উলটো দিকে ঘুরে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম ঘড়িটা বোধহয় খারাপ হয়েছে। এখন দেখছি তোমারটাও তাই।"

রজোগুণ ঘড়িটা হাতে নিয়ে দেখল। বাস্তবিকই তাই। সেকেণ্ডের কাঁটাটা উলটোদিকে ঘুরে যাচ্ছে। মিনিটের কাঁটাও পাক খাচ্ছে উলটোবাগে।

দু' ভাই দু' ভাইয়ের দিকে বোকার মতো চেয়ে থাকে।

ভূতেদের নিয়ম হল তারা দিনের বেলা ঘুমোয়, রাতের বেলা জাগে। এ-ব্যাপারে প্যাঁচা বা বাদুড়ের সঙ্গে তাদের বেশ মিল আছে। অনেকেই বলে থাকে যে, ভূত মাছ-ভাজা খেতে ভালবাসে। কিন্তু সর্বশেষ গবেষণায় জানা গেছে, ভূতেরা আসলে কোনও কঠিন বা তরল খাদ্য খেতে পারে না। তারা খায় বায়বীয় খাবার। যেমন বাতাস, গন্ধ, আলো, অন্ধকার ইত্যাদি।

জটাই তান্ত্রিকের পোষা ভূত বাঞ্ছারাম ঘুমোয় একটা মেটে হাঁড়ির মধ্যে। বেশি বায়নাক্কা নেই। সন্ধে হলে নিজেই উঠে পড়ে।

জটাই তান্ত্রিক সন্ধে হতেই বাঞ্ছারামের উদ্দেশে একটা হাঁক দেন, "ওরে বাঞ্ছা!"

হাঁড়ির ভিতর থেকে বাঞ্ছারাম সড়াত করে বেরিয়ে আসে।

ভূতের রূপ নিয়েও নানারকম মতভেদ আছে। কেউ বলে, বুড়ো আঙুলের সাইজ, হাত পা নেই, শুধু মুণ্ডু। কেউ বলে, যার ভূত তার মতোই দেখতে হয়। অনেকের মতে ভূত খুব রোগা কালো এবং তাদের পায়ের পাতা থাকে উলটোদিকে।

বাঞ্ছারামের চেহারা কী রকম তা আমরা জানি না। কারণ, একমাত্র জটাই তান্ত্রিক ছাড়া আর কেউ তাকে চোখে দেখেনি। জটাই নিজে কখনও কাউকে বলেননি যে, বাঞ্ছা কীরকম দেখতে।

সন্ধে লাগতে না লাগতেই মেলা বুড়োবুড়ি এবং তাঁদের নাতিপুতিরা জড়ো হয়েছে জটাইয়ের আস্তানায়। এ সময়ে জটাই বিস্তর রুগিকে ওষুধ দেন, ভবিষ্যৎ বলেন, হারানো জিনিসের হদিস বাতলান, ধর্মকথা বলেন। সবাই রোজ বাঞ্ছারামের চেহারাটা দেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাপীতাপীর চোখ, তাই দেখতে পান না।

কিন্তু জটাই তান্ত্রিক পান। এমনভাবে শূন্যের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন যেন একেবারে জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছেন।

জটাই তান্ত্রিক বাঞ্ছারামের দিকে চেয়ে একটা ধমক দিলেন, "বলি হারানের সেই চুরি-যাওয়া ঘড়িটার হদিস করলি?"

বাঞ্ছারামের জবাব শোনা যায় না। কিন্তু সবাই বুঝতে পারে যে, সে আছে।

ক'দিন হল এ তল্লাটে নিত্য দাস নামে এক বৈষ্ণব এসে ঘাঁটি গেড়েছে। বয়স বেশি নয়। বড্ড জ্বালাচ্ছে। জটাই তান্ত্রিক বৈষ্ণবদের মোটেই সহ্য করতে পারেন না। তুলসীর মালা, তিলক, কোলকুঁজো বিনয়ী ভাব, অমায়িক হাসি, মিঠি-মিঠি কথা, এসব তাঁর ভারী মেয়েলিপনা মনে হয়। হ্যাঁ, পুরুষের সাধনা বললে বলতে হয় তন্ত্রকে। শবের ওপর বসে মাঝরাতে সাধনা, ভূতপ্রেত নিয়ে কারবার, করোটিতে কারণ পান, বৈষ্ণবদের দুর্বল কলজে এসব সহ্যই করতে পারবে না।

কিন্তু নিত্য দাস লোকটা অতি ঘড়েল। সকালবেলাতেই সে মাধুকরীতে বেরোয়। অর্থাৎ সোজা কথায় ভিক্ষে, ভিক্ষে জিনিসটা দু'চোখে দেখতে পারেন না জটাই তান্ত্রিক। যাতায়াতের পথে নিত্য আজকাল রোজই

জটাই তান্ত্রিকের আস্তানায় হানা দেয়। মিহি সুরে বলে, "জয় নিতাই, জয় রাধামাধব, জয় মহাপ্রভু।"

জটাই তান্ত্রিকও জলদ-গম্ভীর স্বরে হুহুংকার দিয়ে ওঠেন, "জ্জয় ক্কালী। জ্জয় ক্কালী। জ্জয় শিবশম্ভো। ববম বম।"

এই হুংকারে বহু মানুষ ভিরমি খেয়েছে। কিন্তু নিত্য দাস সেই পাত্র নয়। বিনয়ে গলে পড়ে কান-এঁটো-করা হাসি হেসে জোড়হাতে সে রোজ বলে, "কৃষ্ণের দয়া হোক, রাধারানীর দয়া হোক, মহাপ্রভুর দয়া হোক। রাধা আর কালী কি আলাদা রে মন? প্রভু কৃষ্ণ যে, সেই না শিব! পেন্নাম হই প্রভু, একটু চা প্রসাদ হবে না ঠাকুর?"

জটাই লোকটাকে দেখতে পারেন না বটে, কিন্তু তাড়াতেও পারেন না। নিত্য দাসের ধূর্ত চোখ দেখেই বোঝেন, হেঁটো মেঠো লোক নয়। এলেম আছে। লোক চরিয়ে খায়। জটাই তাই বেজার মুখে বলেন, "হবে চা। বসে যাও।"

চা খেতে খেতে রোজই দুজনের কিছু কথাবার্তা হয়।

"বলি ওহে বৈষ্ণব, আর কতদূর?"

"অনেক দূর বাবা, এখনও অনেক দূর। রাধারানীর মায়া। যে কলের মধ্যে ফেলে রেখেছেন, সেখানকার বন্ধন কি সহজে কাটে প্রভু?"

"তৈরি লোক দেখছি। বলি ভিক্ষে-সিক্ষে জুটছে কেমন?"

"আজ্ঞে প্রভুর দয়া। জোটে কিছু।"

"তা এদিকেই ডেরা করবে নাকি?"

"রাধারানীর ইচ্ছে প্রভু।"

জটাই তান্ত্রিক বোঝেন যে, নিত্য দাস এই যে রোজ এসে তাঁর ডেরায় হানা দেয় এর পিছনে কোনও মতলব আছে। কিন্তু কী মতলব, তা জটাই অনেক ভেবেও বের করতে পারেননি।

হারান ঘড়িটা রেখে গেছে। জটাই তান্ত্রিক একটু নেড়েচেড়ে দেখলেন। ঘড়িটা একটু অদ্ভুত রকমের। ঠিক এরকম ঘড়ি তিনি আগে আর দেখেননি। পৃথিবীতে যে আজকাল কত রকম কল চালু হয়েছে। ছোট্ট একটা নোটবইয়ের আকারের যন্ত্র বেরিয়েছে, ক্যালকুলেটর, তাই দিয়ে চোখের পলকে বড় বড় সব আঁক কষে ফেলা যায়। এমন আরও কত কী!

হারানের ঘড়িটায় চব্বিশটা ঘর আছে। ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটা তো আছেই। তা ছাড়া ডায়ালের ওপর আরও তিনটে ছোট-ছোট ডায়াল এবং সেখানেও দুটো করে কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে। জটাই আরও নিবিষ্টভাবে লক্ষ করে দেখতে পেলেন, গোটা ডায়ালটায় ঝাঁঝরির মতো ছিদ্র রয়েছে। কিন্তু এত সূক্ষ্ম যে, খালি চোখে ভাল বোঝা যায় না।

ঘড়িটা যখন খুব নিবিষ্টমনে দেখছেন, তখন খুব কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, "খুচ খুচ। খুচে। রামরাহা।"

জটাই চমকে উঠলেন, হাঁক দিলেন, "কে রে?"

কিন্তু ধারে-কাছে কেউ নেই। দিনের আলোয় চারদিক ফটফট করছে। জটাই বেকুবের মতো চারদিকে তাকাতে লাগলেন।

"জয় রাধে! জয় নিতাই! জয় রাধাগোবিন্দ। ভাল আছেন তো প্রভু?" বলতে বলতে নিত্য দাস এসে হাজির। মুখে বিগলিত হাসি।

জটাই তান্ত্রিক এমন ভড়কে গেছেন যে, 'জ্জয় ক্কালী' বলে হাঁক মারতে পর্যন্ত ভুলে গেলেন। মাথা চুলকোতে চুলকোতে মনের ভুলে বলে ফেললেন, "জয় নিতাই, ভাল আছ তো নিত্য দাস?"

নিত্য দাস তান্ত্রিকের মুখে 'জয় নিতাই' শুনে চোখের পলক ফেলতে পর্যন্ত ভুলে গেছে। হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে বলতে লাগল, "ভূতের মুখে রাম নাম! ভূতের মুখে

রাম নাম! জয় নিত্যানন্দ, জয় রাধাগোবিন্দ! জয়..."

কিন্তু এই সময় ভারী বেসুরো গলায় কে যেন খুব কাছ থেকে ধমকের স্বরে বলে ওঠে, "রামরাহা! খ্রাচ খ্রাচ! রামরাহা! রামরাহা! খুচ খুচ!"

"কিছু বলছেন প্রভু?" বলে নিত্য দাস জটাইয়ের দিকে তাকায়।

জটাইও চারদিকে তাকাতে তাকাতে মাথা নেড়ে বললেন, "না। কিন্তু কেউ কিছু বলছে।"

"কী বলছে প্রভু? বড় বিচিত্র ভাষা?"

আচম্বিতে আবার সেই অশরীরী স্বর বলে উঠল, "নানটাং! রিকিরিকি! রামরাহা!"

নিত্য দাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠে, "জয় কালী! জয় কালী!"

জটাই তান্ত্রিক তার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু দুর্বল গলায় বললেন, "কালীর নাম নিলে তাহলে?"

নিত্য দাস অভিমানের চোখে জটাইয়ের দিকে চেয়ে থেকে বলে, "আমার সঙ্গে ছলনা কেন প্রভু? সবই বুঝতে পেরেছি। একটু পায়ের ধুলো দিন প্রভু। আপনার বাঞ্ছারাম ভূতকে এতকাল বিশ্বাস করিনি। ভাবতাম প্রভু বুঝি গুল দিচ্ছেন। আজ প্রমাণ পেলাম।"

"বাঞ্ছারাম!" বলে জটাই তান্ত্রিক একটু ভাবিত হয়ে পড়লেন। তারপর হতাশ গলায় বললেন, "তাই হবে।"

"প্রভুর কী মহিমা!" বলে নিত্য দাস কিছুক্ষণ তদ্গতভাবে চোখ বুজে থেকে বলে, "প্রভুর মহিমায় ভূতের মুখে পর্যন্ত রামনাম শোনা গেল।"

জটাই তান্ত্রিক একটু চমকে উঠে বললেন, "বলছে নাকি?"

"ছলনা কেন প্রভু? স্বকর্ণে শুনেছি, বাঞ্ছারাম বলছে, রামরাহা। রামরাহা।"

"তাই বটে। "

"কিন্তু প্রভু। রামের সঙ্গে ওই রাহা কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আর ওই খুচ খুচ খ্রাচ খ্রাচগুলোরই বা মানে কী? ভুতুড়ে ভাষা নাকি?"

জটাই তান্ত্রিক কাঁচমাচু মুখে বললেন, "তাই হবে বোধহয়।"

এই সময়ে হঠাৎ দু'জনকে চমকে দিয়ে একটা মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর ভারী সুরেলা গলায় বলতে লাগল, "র‍্যাডা ক্যালি! রামরাহা! বুত! বুত!"

নিত্য দাস চোখ বড় বড় করে জটাইয়ের দিকে চেয়ে বলে, "এটি কে প্রভু? বাঞ্ছাসীতা নয় তো!"

"বাঞ্ছাসীতা!" জটাই তান্ত্রিক শুকনো মুখে বলেন, "সে আবার কে?"

"কেন, বাঞ্ছারামের বউ! আহা, ভূতের মুখে এসব শুনলেও প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। বলল রাধা কালী রাম ভূত।"

জটাই তান্ত্রিক বে-খেয়ালে বলে উঠলেন, "জয় রাধে! জয় রাধে!"

নিত্য দাস মাথা নেড়ে বলে, "ও নাম নেবেন না প্রভু। বোষ্টম ধর্ম কোনও ধর্মই নয়। আজ বুঝলাম তন্ত্রসাধনাই হল আসল সাধনা। জয় কালী! জয় শিবশম্ভো!"

ছলছলে চোখে নিত্য দাস সাষ্টাঙ্গে জটাই তান্ত্রিকের পায়ের ওপর পড়ে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় আর জিবে ঠেকাল। তারপর মনের ভুলে চা না খেয়েই বিদায় হল।

দুপুরবেলায় ছানু আর কদম আর লাটুর মিটিং বসল। দাদুর হারানো ঘড়ি নিয়ে তারা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

লাটু অসম্ভব দাদুভক্ত। সে বলল, "ঘড়িটার জন্য দাদুকে ঠাকুমার কাছে অপমান হতে হচ্ছে। এটা আমি সহ্য করতে পারছি না। ঘড়িটা খুঁজে বের করতেই হবে।"

ছানু আর কদম একটু ঠাকুমা-ঘেঁষা। ছানু ঠোঁট উল্টে বলল, "খুঁজে বের করে কী লাভ? দাদু তো আবার হারাবে।"

কদমও মাথা নেড়ে বলল, "খুঁজে বের করতে পারলেও ঘড়িটা দাদুকে ফেরত দেওয়া হবে না। ঠাকুমার কাছে থাকবে। দাদু দরকারমতো ঠাকুমার কাছ থেকে কটা বেজেছে জেনে নেবে।"

লাটু বলল, "দাদু কি আর ইচ্ছে করে হারায়! তা ছাড়া এবার হয়তো দাদু ঠিকই বলছে। ঘড়িটা হারায়নি। সারাতেই দেওয়া হয়েছে।"

ছানু বলল, "মোটেই নয়। ঠাকুমার ভয়ে দাদু ওসব বানিয়ে বলছে। মনে নেই এর আগেরবার দাদু বারবার বলছিল যে, ঘড়িটা চুরি যায়নি, চুরি গেছে রেডিওটা!"

কদমও সায় দিয়ে বলে, "ঠিক কথা। ঘড়ির ব্যাপারে দাদু সত্যি কথা কমই বলে। আমার মনে আছে গতবছর নীল ডায়ালের যে ঘড়িটা হারাল, দাদু বলেছিল, সেটা নাকি চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে। আমরা বাচ্চা মানুষরাও জানি যে, চিলে ঘড়ি নেয় না।"

লাটু একটু রেগে গিয়ে বলে, "দাদু মোটেই মিথ্যে কথা বলেনি। জয়গোপালের দোকান থেকে গরম জিলিপি নিয়ে আসছিল দাদু। চিলটা ছোঁ মারে। দাদু জিলিপির ঠোঙা বাঁচাতে হাতচাপা দেয়। চিলটা ঠোঙার বদলে হাত থেকে ঘড়িটা ভুল করে নিয়ে যায়। ভেলভেটের ব্যান্ড ছিল তাই নিতে পেরেছে।"

কদম বলল, "গুল। চিলে ঘড়ি নিলে দাদুর কব্জিতে আঁচড়ের দাগ থাকত।"

ছানু বলল, "সাদা ডায়ালের যে ঘড়িটা তার আগে হারিয়েছিল, সেটাও কিছুতেই ম্যাজিশিয়ান ভ্যানিশ করে দেয়নি। ম্যাজিশিয়ান কিছু ভ্যানিশ করলে তা ফের ফিরিয়ে আনে।"

লাটু বলে, "তোরা সব সময়েই দাদুর দোষ দেখিস। দাদুর দোষটা কী? বাজারের পথে লোকটা ম্যাজিক দেখাচ্ছিল। নানারকম জিনিস হামানদিস্তেয় গুঁড়ো করে ফের টুপি থেকে আস্ত আস্ত বের করছিল। দাদু তার ঘড়িটা দেয়। ম্যাজিশিয়ান যখন হামানদিস্তায় সব গুঁড়ো করে টুপিটার ঢাকনা খুলতে যাচ্ছে, ঠিক সেইসময়ে বাজারের কয়েকটা দুষ্টু ছেলে শিবের ষাঁড় বিশ্বেশ্বরকে খেপিয়ে দিল যে! বিশ্বেশ্বরের তাড়া খেয়ে সব লোকজন চোঁ-চাঁ দৌড়াল। সেই ম্যাজিশিয়ান কোথায় উধাও হল কে বলবে? দাদু যে কোনওক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিল এই ঢের। প্রাণের চেয়ে কি ঘড়ি বেশি?"

কদম হুঁ হুঁ করে মাথা নেড়ে বলে, "তুই বড্ড দাদুর দিকে টানিস। কালো ডায়ালের ঘড়িটা তাহলে আমাদের গোরু ধবলীই খেয়েছে! দাদু বলেছিল জাবনা মাখতে গিয়ে ঘড়িটা জাবনার সঙ্গে মিশে যায় আর ধবলী নিশ্চয়ই সেটা জাবনার সঙ্গে খেয়ে নিয়েছে। বলেছিল তো?"

"তাতে দোষটা কী হল?" লাটু বুক চিতিয়ে প্রশ্ন করে।

"ধবলী যদি গিলেই থাকে তবে পরদিন তার গোবর ঘেঁটে ঘড়িটা আমরা পেলাম না কেন?"

"ঘড়িটা হয়তো ও হজম করে ফেলেছে।"

"ঘড়ি কখনও হজম হয়? মোটেই জাবনার সঙ্গে ঘড়ি মিশে যায়নি।"

লাটু বিপন্ন হয়ে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা। অত পুরনো কথায় কাজ কী? এ ঘড়িটা নিয়ে মিটিং ডাকা হয়েছে, এটা নিয়েই কথা হোক।"

"কথা হোক।"

"কথা হোক।"

লাটু বলল, "ঘড়িটা আমরা খুঁজব। প্রথমে আমরা দাদুর কাছে গিয়ে নানারকম প্রশ্ন করে জেনে নেব ঠিক কী কী সকালবেলায় ঘটেছে।"

কদম বলল, "কী লাভ? দাদু তো সত্যি কথা বলবে না।"

ছানু বলল, "শুধু তাই নয়, দাদু অনেক কিছু বানিয়ে বলে আমাদের কাজ আরও জটিল করে তুলবে।"

লাটু চোখ কটমট করে তাকিয়ে বলল, "তাহলে তোমরা বলতে চাও যে, আমাদের দাদু একজন মিথ্যেবাদী?"

ছানু বলল, "মোটেই নয়।"

কদম বলে, "আমরা বলতে চাই আমাদের দাদু ঘড়ি হারানোর ব্যাপার ছাড়া অন্য সব বিষয়েই সত্যবাদী।"

ছানু যোগ করে বলল, "শুধু ঘড়ি নয়। দাদু আরও কিছু কিছু জিনিস হারান। যেমন, চটিজুতো, বাঁধানো দাঁত, চশমা, লাঠি, পয়সা..."

লাটু বাধা দিয়ে বলল, "অন্য সব কথা থাক। আমরা শুধু একটা বিষয়েই আজ আলোচনা করব।"

এইভাবে অনেক তর্কবিতর্কের পর একটা কাগজে কয়েকটা প্রশ্ন লেখা হল। দাদুকে এই প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু এমনভাবে করা হবে যাতে দাদু বুঝতে না পারেন যে, তাঁকে জেরা করা হচ্ছে।

লাটু পরামর্শ দিল, "মাথা চুলকোলে দাদু খুব আরাম পায়। অতএব আমি যখন দাদুকে জেরা করব তখন কদম তাঁর মাথা চুলকোবে। আর ছানু, তুই দাদুর পায়ের আঙুলগুলো টেনে দিবি।"

এসব পরামর্শ শেষ করে তিন ভাইবোনে উঠল।

দিবানিদ্রার পর হারানচন্দ্র বিষণ্ণ মুখে দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে বসে ছিলেন। মনটা খুবই খারাপ। তাঁকে এ বাড়ির কেউ বিশ্বাস করে না। তা ছাড়া তিনি কস্মিনকালেও ভূত প্রেত ঈশ্বর কিছুই মানেননি। কিন্তু এখন ঠেকায় পড়ে সব কিছুকেই একরকম স্বীকার করে ফেলতে হবে হয়তো। এটাকে তিনি একটা হেরে-যাওয়া বলে মনে করেন। ভূতকেই যদি মানেন তবে ঈশ্বরকে মানতেও দেরি হবে না। ওই যে কী একটা কথা আছে না, ইফ উইনটার কাম্‌স ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড?
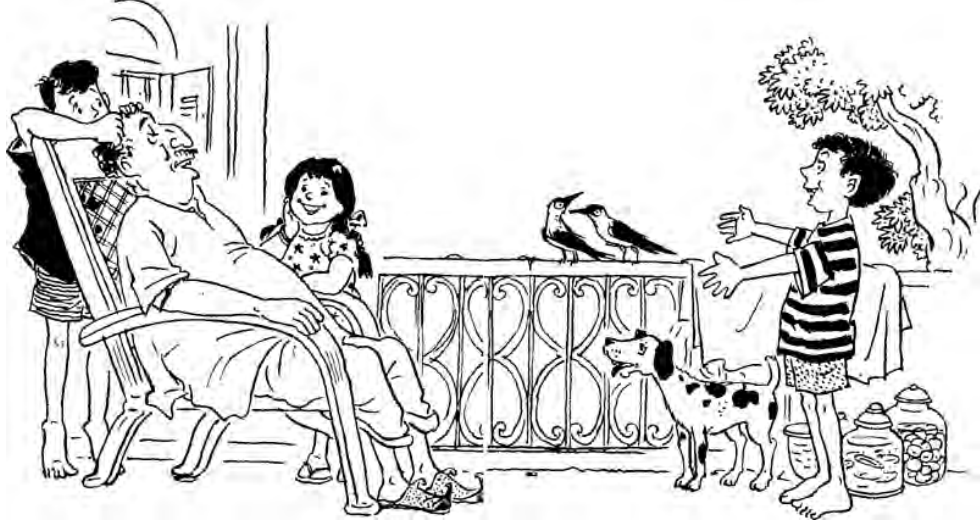
খুব আনমনে বসে ছিলেন হারানচন্দ্র। হঠাৎ তিন নাতি-নাতনি এসে হাসি হাসি মুখে তিনদিকে দাঁড়াল।

"দাদু, তোমার মাথা চুলকে দেব?"

"দাদু, তোমার পায়ের আঙুল টেনে দিই?"

তিনজনই বিচ্ছু। তার মধ্যে লাটুটা তাঁর ন্যাওটা। হারানচন্দ্র একটু সন্দেহের চোখে ওদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "তা দে।"

কদম আর ছানু দাদুর সেবায় লেগে গেল। হারানচন্দ্র ভারী আরাম পেয়ে চোখ বুজে ফেললেন। ঘুম-ঘুম ভাব।

লাটু খুব মিঠে গলায় ডাকল, "দাদু!"

"হুঁ।"

"আজ সকালে তুমি কি উত্তরদিকে বেড়াতে গিয়েছিলে?"

"উত্তরদিক! তা হবে বোধহয়।"

"ঠিক করে বলো।"

"কেন রে? দিক দিয়ে কী করবি?"

"আমাদের একটা বাজি হয়েছে। বলো না।"

"হ্যাঁ। উত্তরদিকেই।"

"বেড়ানোর সময় তোমার সঙ্গে কারও দেখা হয়েছিল?"

"হয়েছিল বোধহয়।"

"বলো না।"

"আঃ, বড্ড জ্বালাচ্ছিস। এখন যা।"

ছানু বলল, "তাহলে কিন্তু পায়ের আঙুল টানব না।"

কদম বলল, "আমিও মাথা চুলকোব না। "

দাদু তিনজনকে আর একবার দেখে বলেন, "মতলবখান কী তোদের? অ্যাঁ!"

“আগে বলো।” লাটু বলে।

হারানচন্দ্র বলেন, “হয়েছিল দেখা।”

“কার সঙ্গে?”

“অনেকের সঙ্গে। সব কি মনে থাকে?”

“মনে করে বলো।”

মাথা চুলকোনো আর পায়ের আঙুল টানার আরামে চোখ বুঁজে হারানচন্দ্র বললেন, “একটা বেঁটে লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, ক’টা বাজে। তা আমি একটু লক্ষ করে দেখলাম লোকটার মাথায় দুটো শিং আছে।”

কদম বলল, “এঃ, এটা একদম চলবে না দাদু। গুল।”

হারানচন্দ্র হার না মেনে বললেন, “আর একটা ঢ্যাঙা লোকের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। সেও সময় জানতে চায়। তা দেখলাম এ লোকটার হাতের চেটো আর পায়ের পাতা অবিকল বাঘের থাবার মতো।”

ছানু আঙুল টানা বন্ধ করে বলল, “ভাল হচ্ছে না কিন্তু দাদু। আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি।”

লাটু হতাশ হয়ে বলে, “এরকম করলে তদন্ত এগোবে কী করে বলো তো?”

হারানচন্দ্র অবাক হয়ে বলেন, “কিসের তদন্ত?”

ছানু বোকার মতো বলে ফেলল, “বাঃ, তোমার ঘড়িটা চুরি গেছে না! আমরা সেটা খুঁজতে বেরোব যে!”

লাটু ছানুর মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে বলল, “বললি কেন?”

“তদন্তের কথা তুই-ই তো বলে ফেললি!” ছানু মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে।

হারানচন্দ্র দুজনের মাঝখানে পড়ে বললেন, “বুঝেছি। তোরা ধরে নিয়েছিস যে, ঘড়িটা চুরিই গেছে! কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। ঘড়িটা এক জায়গায় আছে। খুব ভালই আছে। সেটা ফেরতও পাওয়া যাবে। চিন্তা নেই।”

লাটু বলল, “কোথায় আছে সেটা আমরা জানতে চাই। ঘড়ির ব্যাপারে তোমার যে বদনাম হয়ে যাচ্ছে তা আর আমরা সহ্য করব না। কাকে দিয়েছ বলো।”

হারানচন্দ্র জটাইয়ের কথাটা বলতে চান না। বললে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াবে কে বলতে পারে। তিনি ভূত ভগবান তন্ত্রমন্ত্র কিছুই মানেন না। এই দুই নাতি-নাতনিরা যদি জানতে পারে যে, তাঁর ঘড়িতে ভূত ভর করেছে, এবং সেটা শোধন করতে জটাইকে দিয়েছেন, তবে এরা খেপিয়ে মারবে। তিনি একটু চিন্তা করে লাটুর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, “বলতেই হবে?”

“বলতেই হবে।”

হারানচন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “রাস্তায় হঠাৎ গর্ডন সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গর্ডন তো যন্ত্রপাতি নিয়েই থাকে সারাদিন। ঘড়িটা একটু ফাস্ট যাচ্ছিল বলে তাকে দেখালাম। গর্ডন বলল, সারিয়ে দেবে। তাই তাকে দিয়েছি সারাতে।”

গর্ডন সাহেবের উল্লেখে তিন ভাইবোনের মুখ শুকিয়ে গেল। গর্ডন সাহেবকে ভয় পায় না এমন লোক এই অঞ্চলে কমই আছে। বিশেষ করে বাচ্চারা। তা বলে গর্ডন যে লোক খারাপ তা নয়। বয়স প্রায় হারানচন্দ্রের মতোই হবে। ধবধবে সাদা দাড়ি। ধবধবে সাদা গায়ের রং। খাঁটি সাহেব। সেই ইংরেজ আমল থেকেই এখানে আছে। তার বাপ-মাও এখানেই ছিলেন। মরার পর তাঁদের এখানকারই কবরখানায় কবর দেওয়া হয়। গর্ডন

আর দেশে ফিরে যায়নি। তার বাপের বিরাট ব্যবসা ছিল কলকাতায়। ছেলের জন্য বিশাল একখানা বাড়ি, প্রচুর টাকা আর কোম্পানির শেয়ার রেখে গেছেন। তাতে গর্ডনের ভালই চলে যায়। থাকার মধ্যে আছে এক বুড়ি পিসি। ভারী খিটখিটে আর ঝগড়ুটে বলে বুড়িকেও সবাই ভয় খায়। গর্ডন সাহেবের নানা বাতিক। এক গাদা ভয়ংকর চেহারার কুকুর আছে তার। নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি করার জন্য সে একটা বড়সড় ওয়ার্কশপ বানিয়েছে নিজের বাড়িতে। দিনরাত সেখানে খুটখাট দমাস-দুম শব্দ হয়। কখনও হঠাৎ গলগল করে হলুদ ধোঁয়া বেরোয় তার ওয়ার্কশপ থেকে। কখনও বা বিটকেল সব রাসায়নিকের গন্ধে বাতাস ভরে যায়। মাঝরাত্তিরে হঠাৎ হয়তো নীল আগুনের শিখা ওঠে আকাশে। প্রথম প্রথম এসব দেখে বিপদ ঘটেছে ভেবে মানুষ ছুটে যেত। এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবে গর্ডন সাহেবের এসব কাণ্ড দেখে সকলেই তাকে এড়িয়ে চলে। একসময়ে শোনা গিয়েছিল গর্ডন সাহেব একটা উড়ুক্কু মোটর সাইকেল তৈরি করছে। আর একবার রটে গেল, গর্ডন একটা কলের মানুষ তৈরি করেছে এবং সেই কল-মানুষ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ অবধি সব করতে পারে। আর একবার গুজব শোনা গেল, গর্ডন এমন একটা হাওয়া-কল তৈরি করেছে যা দিয়ে ইচ্ছেমতো ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করা যায়। এগুলো সত্যি না মিথ্যে তা কেউ জানে না, কিন্তু নানারকম রটনার ফলে সকলেই গর্ডনকে একটু সমঝে চলে।

গর্ডন খুব লম্বাচওড়া আর গম্ভীর মানুষ। বড় একটা হাসেটাসে। হাতে থাকে গাঁটওয়ালা একটা মোটা লাঠি। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। চামড়ার ফিতেয় বাঁধা তিন-চারটে বিকট কুকুর নিয়ে যখন সে রাস্তায় বেরোয়, তখন বাচ্চারা তরাসে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে সেঁধোয়। গর্ডনের বাগানে আম জাম পেয়ারা কিছু কম নেই। কিন্তু ভয়ে কেউ সেই বাগানের ধারেকাছে যায় না। এক ভয় কুকুরের, আর এক ভয় মাটির নীচেকার চোরা কুঠুরির। মায়েরা দুষ্ট বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্য চিরকাল বলে এসেছে, গর্ডন সাহেব এসে ধরে নিয়ে গিয়ে পাতালঘরে কুলুপ এঁটে রাখবে।

তাই দাদুর কাছে গর্ডনের কথা শুনে ছানু কদম আর লাটুরও মুখ শুকিয়ে গেল। কথাটা মিথ্যে নাও হতে পারে। কারণ গর্ডন বাস্তবিকই নানারকম যন্ত্রবিদ্যা জানে। দাদুর সঙ্গে তার ভাব প্রায় সেই ছেলেবেলা থেকেই।

তিন ভাইবোন আবার বাগানে গিয়ে মিটিঙে বসল।

ছানু বলল, "দাদু গর্ডন সাহেবের কথা বলে ঘড়ি হারানোর ব্যাপারটা চাপা দিতে চাইছে। "

কদম বলল, "আমারও তাই মনে হয়।"

লাটু মাথা নেড়ে বলল, "মোটেই নয়। ঘড়িটা একটু বিটকেল দেখতে তো ছিলই। বাবাকে ঠকিয়ে কেউ ঘড়িটা গছিয়ে দিয়েছে। বিটকেল ঘড়ি গর্ডন সাহেব ছাড়া আর কে সারাবে? দাদু ঠিক কাজই করেছে।"

কদম বলে বসল, "তুই তো দাদুর ল্যাংবোট।"

ছানু বলল, "একদম ল্যাংবোট। দাদু যেদিকে, তুই-ও সেদিকে। দাদু যদি সত্যি কথাই বলে থাকে, তবে সেই শিং আর লেজওয়ালা বেঁটে লোক, থাবাওয়ালা লম্বা লোকের গল্পও সত্যি। "

লাটু খেঁকিয়ে উঠে বলে, "সত্যি নয় তো শুনে ভয় পাচ্ছিলি কেন?"

ছানুও সমান তেজে বলল, "তুইও তো দাদুর মতো ভূত মানিস না, ভগবান মানিস না, তাহলে রাতে একা ঘরে শুতে আর বাথরুমে যেতে ভয় পাস কেন? আর কেনই বা পরীক্ষার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে সরস্বতীর ছবি প্রণাম করে যাস?"

এইরকম যখন তিন ভাইবোনে তর্ক চলছে, সেই সময় নিত্য দাস "জয় কালী কলকাত্তাওয়ালি! জয় শিবশম্ভো! জয় করালবদনী!" বলে এসে ফটকে দাঁড়াল। শুনে তিন ভাইবোনে তো থ! কারণ নিত্য দাস পরম বৈষ্ণব। শাক্তদের সে মোটেই পছন্দ করে না। যেমন জটাইদাদু রাধা বা কৃষ্ণের নাম শুনলে তেড়ে মারতে আসেন তেমনি, নিত্য দাস কালীর নাম শুনলে জিব কাটে। সেই নিত্য দাসের মুখে কালীর জয়ধ্বনি শুনলে কে না মূর্ছা যাবে?

তিনজনে দৌড়ে গিয়ে নিত্য দাসকে ঘিরে ধরল। লাটু বলল, "তুমি কালীর নাম নিচ্ছ, ব্যাপার কী গো নিত্যদা?"

নিত্য দাস মাথা নেড়ে বলল, "কালীর নাম নেব না তো কার নাম নেব? কালীই আসল?"

"তুমি না বোষ্টম!"

"সে ছিলাম আজ সকাল অবধি। জটাইবাবার যা মহিমা দেখলাম, তাতে মনে হল, ছ্যা ছা, এতকাল করেছি কী? তন্ত্রসাধনার মতো জিনিস আছে? আজ সকাল থেকে আমি তান্ত্রিক হয়ে গেছি।"

"কী দেখলে বলো না!" বলে কদম নিত্য দাসের কাপড়জামা টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দিল।

"ওঃ, সে যা দেখলাম দিদি, বলার নয়। চারদিকে যেন ভূতের বৃষ্টি। লম্বা ভূত, বেঁটে ভূত, চালাক ভূত, গানদার ভূত একেবারে গিজগিজ করছে বাবার থানে।"

"সত্যি! ও মাগো!" বলে কদম নিত্য দাসকে জাপটে ধরে।

নিত্য দাস তাকে কোলে নিয়ে হেসে বলে, "ভয় কী দিদি? জটাইবাবার মহিমায় ভূতেরা সব চাকরবাকর হয়ে আছে। ভূতে গান গাইছে, ভূতে বাসন মাজছে, ভূতে বাবার পা দাবাচ্ছে। ওঃ, সে যা দৃশ্য!"

লাটু চাপা গলায় বলল, "গুল!"

নিত্য দাস মাথা চুলকে বলল, "হ্যাঁ, গুলও দিচ্ছে তারা। নিজের চোখে দেখলাম, কয়লার গুঁড়ো, গোবর আর মাটি মেখে এত বড় বড় গুল দিচ্ছে রোদে বসে।"

লাটু বলল, "আর মিথ্যে কথা বোলো না নিত্যদা। ভূত তুমি মোটেই দেখনি।"

নিত্য দাস কথাটা না শোনার ভান করে হঠাৎ হুংকার দেয়, "জয় কালী কলকাত্তাওয়ালি। জয় শিবশম্ভো!"

ছানু লাটুর দিকে চেয়ে বলে, "দাদুর মতো তুইও সব কিছু উড়িয়ে দিস। জটাইদাদুর একটা ভূত তো আছেই। বাঞ্ছারাম।"

"ওটাও গুল।"

নিত্য দাস জিব কেটে বলে, "সে কী কথা! বাবার মুখ দিয়ে জীবনে একটাও মিথ্যে কথা বেরোয়নি। বাঞ্ছারাম তো আছেই, বাঞ্ছাসীতাও আছে। নিজের চোখে দেখেছি।"

লাটু চোখ পাকিয়ে বলে, "কী দেখেছ? আমরা গিয়ে যদি তাদের দেখা না পাই, তাহলে কিন্তু ভাল হবে না নিত্যদা!"

নিত্য দাস এক গাল হেসে কদমকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে, "দেখা পাবে বই কী! তবে দেখার চোখ চাই। প্রথমটায় আমি বুঝতে পারিনি কিনা।"

লাটু বলল, "সে কী রকম?"

নিত্য দাস বলে, “কাউকে বোলো না কিন্তু। ব্যাপারটা হল বাবার থানে সকালে গিয়ে একটু বসেছি, হঠাৎ কারা যেন কাছেপিঠে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। কিন্তু কাউকে দেখছি না। স্পষ্ট শুনছি একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ভুতুড়ে ভাষায় কথা বলছে। নিরিখ পরখ করে বুঝলাম, কথাবার্তা হচ্ছে ঘড়ির ভিতর।”

“ঘড়ির ভিতর?” তিনজনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে।

“তাহলে আর বলছি কী? কিন্তু সে-ঘড়িও যে-সে ঘড়ি নয়। পাক্কা ভুতুড়ে বিটকেল এক ঘড়ি। ঠাহর করে দেখলাম ঘড়ির দুটো কাঁটাই কথাবার্তা বলছে। তখন বুঝতে আর অসুবিধে হল না, বাবা যোগবলে বাঞ্ছারাম আর বাঞ্ছাসীতাকে ঘড়ির দুটো কাঁটা করে রেখে দিয়েছেন। বড় কাঁটাটা বাঞ্ছারাম, ছোটটা তার বউ বাঞ্ছাসীতা।”

লাটু ধমকে ওঠে, “ঘড়িটা কি জটাইদাদুর কাছে আছে?”

নিত্য দাস এক গাল হেসে বলে, “তবে আর কোথায়? সে এক অশৈরি ঘড়ি ভাই। আসল ঘড়ি তো নয়। স্বয়ং শিব বাবার তপস্যায় খুশি হয়ে নিজে এসে দিয়ে গেছেন।”

তিন ভাইবোনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। লাটু উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, “ঘড়ি তাহলে জটাইদাদুর কাছে!”

কদম বলল, “দাদু মিথ্যে কথা বলেছে।”

ছানু বলল, “দাদু গুল মেরেছে।”

লাটু কটমট করে ভাইবোনের দিকে চেয়ে থেকে একটা ধমক দিল, “চোপ! গুরুজন সম্পর্কে শ্রদ্ধা রেখে কথা বলবি।”

নিত্য দাস ভিক্ষে নিয়ে বিদেয় হওয়ার পরেই তিন ভাইবোনে জটাই তান্ত্রিকের বাড়ি রওনা হল।

সন্ধে হয়ে এসেছে। শহরের একেবারে ধারে নির্জন জায়গায় গাছগাছালিতে ঘেরা জায়গাটায় এলেই কেমন গা-ছমছম করে। একটু দূরেই নদী। নদীর ধারে শ্মশান। সন্ধের মুখে গাছগাছালি পাখিতে ভরে গেছে। পাখিদের ডাক ও ঝগড়ার শব্দে জায়গাটা যেন আরও ছমছম করছে।

জটাই তান্ত্রিকের বাড়ি খুবই পুরনো। আসল বাড়িটা খুব বড় ছিল। এখন কয়েকটা থাম আর নোনাধরা দেয়াল ছাড়া বাকিটা ধ্বংসস্তূপ। তার মধ্যেই দু'খানা ইঁটের ঘর কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে মস্ত উঠোন। উঠোনে কয়েকটা বেলগাছ।

তিনজনে খুব সন্তর্পণে আগড় ঠেলে উঠোনে ঢুকল। কেউ কোথাও নেই।

লাটু ডাকল, “জটাইদাদু! ও জটাইদাদু!”

কেউ সাড়া দিল না।

ছানু ভয়ে-ভয়ে বলল, “জটাইদাদু বোধহয় বাড়ি নেই। চল, পালিয়ে যাই।”

লাটু খিঁচিয়ে উঠে বলে, “নেই তো ঘরের দরজা খোলা কেন?”

কদম বলে, “হয়তো জটাইদাদু ধ্যানট্যান করছে।”

লাটুরও একটু ভয়-ভয় করছিল। কিন্তু ভাইবোনের সামনে সেটা পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সে গটগট করে গিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপরই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জটাই তান্ত্রিক ঘরের মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। জ্ঞান নেই। কিংবা মারাও গিয়ে থাকতে পারেন।

লাটু ভয় পেলেও চেঁচাল না। চারদিক চেয়ে দেখতে লাগল। আচমকা সে বাতাসে একটা কড়া চুরুটের গন্ধ পায়।

গর্ডন যে সব সময়েই চুরুট খায়, এটা সবাই জানে।

তিন ভাইবোনের চেঁচামেচি শুনে লোকজন ছুটে এল। অনেক জলের ঝাঁপটা, পাখার বাতাস, জুতোর সুকতলা আর পোড়া কাগজের গন্ধ শোঁকানো সত্ত্বেও জটাই তান্ত্রিকের জ্ঞান ফিরল না। ডাক্তার এসে স্মেলিং সল্টের শিশি ধরলেন নাকে। জটাই তান্ত্রিক তাতেও নড়লেন না। ডাক্তার চিন্তিত মুখে বললেন, "অসুখটা ঘোরালো মনে হচ্ছে। হাসপাতালে পাঠানো দরকার।"

জটাইয়ের অসুখের গোলমালে ঘড়ির ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। লাটু আর কদম আর ছানুরও ঘড়ির কথা মনে রইল না।

হাসপাতালের ডাক্তাররা জটাইকে পরীক্ষা করে মাথা চুলকোতে লাগলেন। অসুখটা যে কী তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। হার্ট ঠিক আছে, নাড়ীও চলছে ঠিকভাবে, ব্লাডপ্রেশার স্বাভাবিক। তাহলে হলটা কী?

সারা রাত নানারকম চিকিৎসা চলল। ভোরের দিকে হঠাৎ জটাই চোখ মেলে তাকিয়ে বিড় বিড় করে এক অচেনা ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। চোখ দুটোর দৃষ্টিও অস্বাভাবিক।

হারানচন্দ্র বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলেন।

জটাই তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "লুলু। রামরাহা, রামরাহা। খুচ খুচ। নানটাং। রিকি রিকি। বুত বুত।"

ডাক্তাররা চাপা গলায় হারানচন্দ্রকে জানালেন, "মাথাটা একদম গেছে। সাবধানে কথা বলবেন। কামড়ে দিতে পারে।"

হারানচন্দ্রের মুখ শুকিয়ে গেল। জটাইকে তিনি এমনিতেই পাগল বলে জানেন। তার ওপর আবার পাগলামির কী দরকার?

জটাই ধমকের স্বরে হারানচন্দ্রকে বললেন, "রামরাহা! রামরাহা! নানটাং। র‍্যাডাক্যালি।"

হারানচন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো বটেই।"

"খ্রাচ খ্রাচ!"

"হ্যাঁ, তাও বটে। তুমি একটু ঠাণ্ডা হও জটাই।"

জটাই হঠাৎ হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলেন।

হারানচন্দ্র একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "হাসির কথা বলছ নাকি? তা ভাল, আমিও একটু হাসি তাহলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ..."

জটাই উঠে বসলেন। তারপর অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ফিসফিস করে বললেন, "খুচ খুচ। লুলু। রামরাহা!"

হারানচন্দ্র ভড়কে গিয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, "সবই ঠিক কথা হে জটাই। সবই বুঝতে পেরেছি। আজ তাহলে আসি।"

হারানচন্দ্র রাস্তায় এসে হাঁটতে হাঁটতে খুবই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। রামরাহা! খ্রাচ খ্রাচ! নানটাং! র‍্যাডাক্যালি! কথাগুলো এমনিতে অর্থহীন এবং অচেনা বটে। কিন্তু এর আগে ঠিক এইরকমই সব শব্দ তিনি যেন কোথায় শুনেছেন! কোথায়? খুব সম্প্রতি শুনেছেন বলেই মনে হচ্ছে।

হাসপাতালের সামনে একটা মস্ত শিশুগাছের তলায় নিত্য দাস বসে ছিল। মুখ শুকনো। চোখের দৃষ্টি ভারী ছলছলে।

হারানচন্দ্রকে দেখে নিত্য দাস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "জয় কালী কলকাত্তাওয়ালি, জয় শিবশম্ভো!"

হারানচন্দ্র চমকে উঠে বলেন, "তুই আবার কবে থেকে কালীভক্ত হলি?"

"আজ্ঞে, সবই প্রভুর কৃপা। তা প্রভুকে কেমন দেখলেন?"

"ভাল নয় রে। মাথা খারাপের লক্ষণ।"

নিত্য দাস হাসল না। তবে গম্ভীর হয়ে খুব দৃঢ় স্বরে বলল, "আজ্ঞে, ওসব ডাক্তারদের চালাকি। প্রভুর সমাধি অবস্থা চলছে।"

"সে আবার কী?"

"আপনি নাস্তিক মানুষ, ঠিক বুঝবেন না।"

"সমাধি কী জিনিস সে আমি জানি। সবই বুজরুকি। তা জটাইয়ের সে-সব হয়নি। উদ্ভট সব কথা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে।"

"তা তো বেরোবেই। দেবতারা সব এ সময়ে কথা বলেন তো ওঁদের মুখ দিয়ে। তা কী বলছেন প্রভু?"

"অদ্ভুত সব শব্দ। নানটাং, রামরাহা, র‍্যাডাক্যালি..."

"অ্যাঁ! বলেন কী! এ যে আমি নিজের কানে কালকেই ভূতেদের বলতে শুনেছি। প্রভুর কাছে বসে ছিলাম সকালে, ভূতপ্রেতরা সব জুটল এসে চারধারে। দারুণ মাইফেল।"

"তুইও শুনেছিস?"

"আজ্ঞে, একেবারে স্বকর্ণে। বাঞ্ছারাম, বাঞ্ছাসীতা আর তাদের সাকরেদরা ওই ভাষাতেই কথা বলে কিনা।"

কথাটা হারানচন্দ্রের খুব অবিশ্বাস হল না। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, সেদিন রাত্রে ঘড়ি বালিশের তলায় নিয়ে শুনেছিলেন। তখন সারা রাত যে সব অশরীরী কথাবার্তা তাঁর কানে এসেছে, তার মধ্যে এইসব অদ্ভুত শব্দ ছিল বটে।

হারানচন্দ্র অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, "রাম রাম। কী যে ভুতুড়ে কাণ্ড শুরু হল!"

নিত্য দাস হঠাৎ 'জয়কালী' বলে হারানচন্দ্রের পায়ের গোড়ায় উপুড় হয়ে বসে মাথা নাড়তে লাগল। "কী বললেন! রাম রাম! এ যে ভূতের মুখে রামনাম গো কর্তা! অ্যাঁ। ঘোর নাস্তিকও প্রভুর মহিমায় রামনাম করতে লেগেছে! উঃ রে বাবা, এ যে একেবারে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছেন প্রভু!"

হারানচন্দ্র লজ্জা পেয়ে বললেন, "দূর বোকা! রাম রাম কি আর ভূতের ভয়ে করেছি নাকি? রাম রাম বলেছি ঘেন্নায়। তা সে যাই হোক, জটাইটা খুব ভাবিয়ে তুলেছে।"

নিত্য দাস মাথা নেড়ে বলে, "কোনও ভয় নেই। আমি বলছি প্রভুর এখন সমাধি চলছে। পিশাচ ভাব। সমাধিটা কেটে গেলেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।"

হারানচন্দ্র হাঁটতে হাঁটতে কী একটু ভেবে জটাইয়ের বাসার দিকে চলতে লাগলেন। যত নষ্টের মূল সেই ঘড়িটা তাঁকে আর একবার ভাল করে দেখতে হবে। জটাই যখন ভূতের গল্পটা বলেছিল, তখন তাঁর ভাল বিশ্বাস হয়নি বটে, কিন্তু এখন নানা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তাঁর মনে হচ্ছে, ঘড়িটা বিশেষ পয়া নয়।

জটাই তান্ত্রিকের ভগ্নস্তূপের মতো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একটু দ্বিধা বোধ করলেন হারানচন্দ্র। একদম একা ঘড়িটার কাছে যেতে এই দিনের বেলাতেও তাঁর সাহস হচ্ছিল না।

কিছুক্ষণ দোনোমোনো করে তিনি অবশ্য ঢুকলেন। উঠোন পেরিয়ে ঘরে উঁকি দিলেন। জটাইয়ের ঘর তালা দেওয়া থাকে না। কারণ দামি জিনিস বলতে কিছুই প্রায় নেই। একটা কুটকুটে কম্বলের বিছানা, একটা ঝোলা, কমণ্ডুল, ত্রিশূল এইসব রয়েছে।

সন্তর্পণে ঘরে ঢুকলেন হারানচন্দ্র। তারপর ঘড়িটা খুঁজতে লাগলেন।

কিন্তু কোথাও ঘড়িটা পাওয়া গেল না। এমন কী, হরি ডোমের করোটির ভিতরেও নয়।

হারানচন্দ্রের মুখ শুকিয়ে গেল। ঘড়ি হারানোয় তাঁর বড় বদনাম। জটাই তান্ত্রিক পাগল হয়ে গেছে, তার ঘরে ঘড়িটা নেই। সুতরাং এটাও হারিয়েছে বলেই ধরে নেবে লোকে। বাসবনলিনী যে কী কাণ্ড করবেন কে জানে।

হারানচন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলেন। এ ঘড়িটা হারানোয় তিনি খুব একটা দুঃখ বোধ করছেন না। হারিয়ে থাকলে একরকম ভালই। আপদ গেছে। কিন্তু বাসবনলিনী তো কোনও ব্যাখ্যাই শুনতে চাইবেন না। দুঃখ এইটাই।

হারানচন্দ্র বাড়ি ফিরতে ফিরতে নানা কথা চিন্তা করছিলেন। আচমকাই তাঁর কানের কাছে কে যেন খুব অমায়িকভাবে বলে উঠল, "রামরাহা। নানটাং। রামরাহা।"

আপাদমস্তক চমকে উঠলেন হারানচন্দ্র। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না। ডান ধারে মজা খালের সোঁতা। বাঁ ধারে গর্ডন সাহেবের বাড়ির পাঁচিল। রাস্তা যতদূর দেখা যাচ্ছে ফাঁকা এবং জনশূন্য।

হারানচন্দ্র তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু আচমকাই কে যেন কাছ থেকে ধমকে উঠল, "রামরাহা! খ্রাচ খ্রাচ! খুচ খুচ!"

বাঁ ধারে গর্ডন সাহেবের বাড়ির ফটক। যারা জানে, তারা কদাচ হুট বলতে ফটক পেরোয় না। কারণ বাগানে সর্বদা দশ-বারোটা বিভীষণ চেহারার কুকুর পাহারা দিচ্ছে। ঢুকলেই ফেচিখেউ করে ধরবে এসে।

কিন্তু হারানচন্দ্রের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে। "রাম রাম রাম রাম" জপ করতে করতে তিনি ফটকটা এক ধাক্কায় খুলে ভিতরে ঢুকে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলেন, "গর্ডন! ও গর্ডন! বাঁচাও!"

আশ্চর্য! আজ একটাও কুকুর তেড়ে এল না। নিঝুম বাড়ি। কারও কোনও সাড়া নেই।

হারানচন্দ্র আতঙ্কিত শরীরে দাঁড়িয়ে শুনলেন, বাতাসের মধ্যে ফিসফাস করে নানারকম কথাবার্তা হচ্ছে। ফটকটা বন্ধ করে হারানচন্দ্র অত্যন্ত দ্রুতবেগে গর্ডনের ওয়ার্কশপের দিকে দৌড়াতে লাগলেন।

বেশি দূর নয়। বাগানের পুবদিকের পাঁচিল ঘেঁষে মস্ত টানা একটা দোচালা। হারানচন্দ্র গিয়ে ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল।

ভিতরে নানা বিটকেল যন্ত্রপাতি। একটা বড় অ্যালুমিনিয়ামের গামলায় চাকা আর মোটর লাগিয়ে গামলা-মোটরগাড়ি বানিয়েছে গর্ডন, উড়ুক্কু মোটর-সাইকেলটাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, একটা কলের মানুষ তৈরি করছে গর্ডন, সেটাও অর্ধেকটা তৈরি। হাতুড়ি, ছেনি, বাটালি, হাপর থেকে শুরু করে নানারকম বৈদ্যুতিক যন্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, কিছুরই অভাব নেই। এই যন্ত্রের জঙ্গলে ঢুকলে খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেতে হয়।

হারানচন্দ্র হাঁফাচ্ছিলেন। চার দিকে চেয়ে হাঁক মারলেন, "গর্ডন! বলি, গর্ডন আছ নাকি?"

সাড়া নেই। আচমকা হারানচন্দ্র নীচের দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন। পায়ের কাছে মস্ত একটা ম্যাস্টিফ কুকুর ওত পেতে বসে আছে।

"ওরে বাবা!" বলে হারানচন্দ্র একটা লাফ মেরে একটা টুলের ওপর উঠে পড়লেন। টুলটা ঠকঠক করে নড়তে লাগল। হারানচন্দ্র চোখ বড়-বড় করে আতঙ্কিতভাবে কুকুরটার দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু কুকুরটার নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল না। বহুক্ষণ লক্ষ করে হারানচন্দ্র বুঝলেন, কুকুরটা জেগে নেই। কিন্তু এত গাঢ় ঘুম কুকুরের কখনও হয় না। শব্দ হলে তো কথাই নেই, অচেনা গন্ধেই কুকুর ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে ওঠে। ম্যাস্টিফটা কি তাহলে মরে গেছে?

হারানচন্দ্র টুল থেকে নেমে নিচু হয়ে কুকুরটার গায়ে হাত রাখলেন। না, কোনও স্পন্দন নেই। নিচু হয়ে হারানচন্দ্র অতঃপর চারদিকে চেয়ে দেখলেন। তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। টুলের নীচে, বেঞ্চির তলায়, টেবিলের ছায়ায় দশ-বারোটা কুকুর পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে আছে। সামনের দুই থাবার মধ্যে নামানো মাথা। হুবহু ঘুমন্ত ভাব। কিন্তু ঘুম নয়। তার চেয়ে গভীর কিছু।

হারানচন্দ্রের বুক কাঁপছিল ভয়ে। কুকুরগুলোর হল কী?

ওয়ার্কশপের এক কোণে গর্ডনের নিজস্ব বিশ্রামের জন্য একটা খোপ আছে। হারানচন্দ্র ধীর-পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে একেবারে বাক্যহারা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়লেন।

প্রথমেই নজরে পড়ল, টেবিলের ওপর তাঁর ঘড়িটা পড়ে রয়েছে। পাশেই একটা ছোট্ট ডাইস ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। ঘড়িটা বোধহয় খোলার চেষ্টা করেছিল গর্ডন। পারেনি। গর্ডনের টুলটা কাত হয়ে পড়ে আছে মেঝেয়। গর্ডন নিজে পড়ে আছে আর-একটু দূরে। চোখ ওল্টানো, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। সংজ্ঞাহীন না প্রাণহীন, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ঘড়িটা নিয়ে হারানচন্দ্র ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলেন। তাঁর চেঁচামেচিতে বিস্তর লোক জমা হয়ে গেল। গর্ডনকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে।

হারানচন্দ্র বাড়ি ফেরার পর হৈ-হৈ পড়ে গেল। তাঁর হাতে ঘড়ি। ঘড়িটা যে ফের ফিরে আসবে, এটা কেউ আশা করেনি।

বাসবনলিনী বললেন, "ও ঘড়ি আর পরতে হবে না। এখন থেকে আমার কাছে থাকবে।"

হারানচন্দ্র বিরস মুখে বললেন, "তাই রাখো। ওই অলুক্ষুনে ঘড়ি আমি কাছে রাখতে চাই না।"

বাসবনলিনী অবাক হয়ে বললেন, "অলক্ষুনে কেন হবে? সত্য কলকাতা থেকে আদর করে কিনে এনে দিল, অলক্ষুনে কিসের?"

হারানচন্দ্রের দৃঢ় ধারণা, ঘড়িটা ভুতুড়ে। কিন্তু সে-কথা বললে তাঁর মান থাকে না। তাই গম্ভীর মুখে বারান্দার ইজিচেয়ারে গিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, ভূত জিনিসটা সত্যিই আছে। এতদিন

প্রমাণ না পেয়ে বিশ্বাস করেননি বটে, কিন্তু এবারে হাড়ে-হাড়ে টের পেতে হচ্ছে। কিন্তু ভয়ের কথা হল, ভূতটা ভয়ংকর শক্তিশালী। যে মানুষ ভূত চরিয়ে খায়, সেই জটাই তান্ত্রিক এই ভূতের পাল্লায় পড়ে পাগলা হয়ে আবোল-তাবোল বকছে। ঘড়িটা জটাইয়ের হাত থেকে কী করে গর্ডনের কাছে গেল সেটা তিনি জানেন না, কিন্তু ঘড়ির ভূত গর্ডনের মতো দশাসই জোয়ানকেও কাত করে ফেলেছে তার বিটকেল কুকুরগুলোসহ। এইরকম সাংঘাতিক ভুতুড়ে ঘড়ি বাড়িতে রাখাটা কি ঠিক হবে? বাসবনলিনী খুবই ডাকসাইটে মহিলা বটে, কিন্তু ভূতটাও কম ত্যাঁদড় তো নয়।

নাঃ, বাসবনলিনীর কাছ থেকে ঘড়িটা নিয়ে তিনি নদীর জলে ফেলে দিয়ে আসবেন! এই ভেবে হারানচন্দ্র উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় নীচের তলা থেকে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল।

হারানচন্দ্র তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে দেখেন বাইরের ঘরে বাড়ির লোকজন জড়ো হয়ে হাঁ করে দেয়ালঘড়িটা দেখছে। সেটার কাঁটা ঘুরছে উল্টোবাগে এবং বোঁ বোঁ করে। হারানচন্দ্র শিউরে উঠলেন। একটা অদৃশ্য হাতই যে এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই।

রজোগুণহরি হারানচন্দ্রকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে মাথা চুলকে বলল, "বাবা, গতকাল আমার আর বহুগুণের হাতঘড়ির কাঁটাও উল্টোদিকে চলছিল। তা ছাড়া, আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার। গতকাল সকালে কয়েকটা ছবি তুলেছিলাম। একটা ছবিও ওঠেনি। কিন্তু আপনার হাতঘড়িটার ছবি উঠেছে। এসব কী হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না।

হারানচন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এসে রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, নীচের চেঁচামেচি বাসবনলিনীর কানে যায়নি। তিনি রান্নাঘরে একটা টুলের ওপর বসে কানের কাছে হাত রেখে খুব নিবিষ্টমনে কী যেন ভাবছেন।

হারানচন্দ্র বললেন, "শুনছ?"

বাসবনলিনী বিরক্তির স্বরে বললেন, "আঃ, একটু চুপ করে থাকো।"

হারানচন্দ্র অবাক হয়ে বলেন, "চুপ করে থাকব? কেন?"

"গানটা একটু শুনতে দাও।"

হারানচন্দ্র হাঁ হয়ে গেলেন। বাসবনলিনী গান শুনছেন? এই দুপুরবেলা ঘরের কাজকর্ম ফেলে রেখে গান! তা ছাড়া গানবাজনা তিনি পছন্দও করেন না। এমন কী, তাঁর শাসনে ছেলেমেয়েরা কেউই গান শেখেনি। সেই বাসবনলিনী কিসের গান শুনছেন?

গলা খাঁকারি দিয়ে হারানচন্দ্র বললেন, “ইয়ে, তা গানটা হচ্ছে কোথায়? আমি তো শুনতে পাচ্ছি না?”

বাসবনলিনী বললেন, “হচ্ছে গো হচ্ছে। এই ঘড়িটার ভিতর থেকে। আজকাল কত কলই যে বেরিয়েছে! ঘড়ির মধ্যে রেডিও। গানটাও অদ্ভুত। এত সুন্দর যে গান হয়, তা তো জানা ছিল না।”

“ঘড়ি!” বলে চোখ কপালে তুললেন হারানচন্দ্র। তারপর হাত বাড়িয়ে বললেন, “দাও! শিগগির দাও! ওই অলক্ষুনে ঘড়ি এক্ষুনি নদীর জলে ফেলে দিয়ে আসা উচিত।”

বাসবনলিনী ফুঁসে উঠে বললেন, “তা বই কী! সত্য কলকাতা থেকে এনে দিয়েছে রেডিওসুদ্ধু ঘড়ি, সেটা নদীর জলে না ফেললে তোমার শান্তি হবে কেন? এত তো ঘড়ি হারালে, এটাকে একটু রেহাই দাও না।”

ফাঁপরে পড়ে হারানচন্দ্র বললেন, “ইয়ে, ঘড়িটা ভাল নয়। ওটার জন্য অনেক গোলমাল হচ্ছে।”

“ভাল নয় মানে? কিসের ভাল নয়? আমি তো জন্মে এত ভাল ঘড়ি দেখিনি বাপু। এটার জন্য গোলমালটা কিসের?”

হারানচন্দ্র জানেন, বাসবনলিনীকে কোনও কথা বোঝাতে যাওয়া বৃথা। উনি বুঝতে চাইবেন না। ভূতের কথাটাও বলা যাচ্ছে না। কারণ সকলেই জানে যে, হারানচন্দ্র ভূত বা ভগবান মানেন না।

হারানচন্দ্র তাই সন্তর্পণে বললেন, “তা ইয়ে, গানটা কী রকম বলো তো! একটু শোনা যায়?”

বাসবনলিনী একগাল হেসে মুঠোয় ধরা ঘড়িটা হারানচন্দ্রের কানের কাছে ধরে বললেন, “শোনো, শুনেই দ্যাখো।”

হারানচন্দ্র শুনলেন। ঘড়ির ভিতর থেকে বাস্তবিকই মৃদু ও ভারী সুন্দর গান ভেসে আসছে। কথাগুলো কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু সেই গান আর বাদ্যযন্ত্রের সুরের মধ্যে সমুদ্রের কল্লোল, বাতাসের দীর্ঘশ্বাস, চাঁদের জ্যোৎস্না, ফুলের গন্ধ, সব যেন একাকার হয়ে গেছে। একটু শুনলেই নেশা লেগে যায়। বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। কেমন যেন।

চকিতে হারানচন্দ্র ঘড়িটা কানের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, “এটা এখন থাক।”

“থাকবে কেন? তুমি না শোনো, আমাকে শুনতে দাও।”

হারানচন্দ্রের মনে পড়ে গেল জটাই তান্ত্রিক, গর্ডন আর কুকুরগুলোর কথা। প্রত্যেকেই এক গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। জটাই জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকে উন্মাদের মতো আচরণ করছে। গর্ডনের জ্ঞান ফিরলে সে কী করবে তা বলা যাচ্ছে না। হারানচন্দ্রের হঠাৎ সন্দেহ হতে লাগল, ওদের ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে এই সম্মোহনকারী গানের সম্পর্ক নেই তো?

হারানচন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন, “এ গান শুনো না। সর্বনেশে গান।”

“কী যে বলো, তোমার মাথার ঠিক নেই। দাও, আর একটু শুনি।”

হারানচন্দ্র ঘড়িটা কব্জিতে বেঁধে ফেলে বললেন, “কটা বাজে সে-খেয়াল আছে? শিগগির ভাত-টাত বাড়ো। ভীষণ খিদে পেয়েছে।”

এ-কথায় কাজ হল। কারও খিদে পেয়েছে শুনলে বাসবনলিনী বড় অস্থির হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি কড়াইয়ের ফুটন্ত ডালনাটা হাতা দিয়ে নেড়ে বললেন, “যাও, তাড়াতাড়ি সবাই স্নান সেরে এসে বসে পড়ো। দিচ্ছি খেতে।”

হারানচন্দ্র ঘড়িটা নিয়ে নিঃশব্দে নিজের ঘরে এলেন। লোহার আলমারিতে ঘড়িটা রেখে আলমারির চাবি নিজের কোমরে গুঁজে নিশ্চিন্ত হলেন।

সারাটা দুপুর হারানচন্দ্র অনেক ভাবলেন। ঘড়িটায় যে রেডিও বা ওই জাতীয় কিছু থাকতে পারে এটা তার অসম্ভব মনে হল না। কিন্তু সত্যগুণহরি কলকাতায় চলে গেছে, সে এমন কথা বলে যায়নি যে, ঘড়িটায় রেডিও ফিট করা আছে। আর রেডিওই যদি হবে তো তার ব্যান্ড কোথায়? কোন সেন্টারের কথা এবং গান শোনা যাচ্ছে? আর সে-গান বা কথা বোঝা যাচ্ছে না কেন? ঘড়িটা যার হাতে যাচ্ছে, সে-ই অদ্ভুত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ছে কেন? রহস্যটা কী?

বিকেলে হারানচন্দ্র হাসপাতালে দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আরও অবাক। পাশাপাশি দুটো বেডে জটাই আর গর্ডন বসে আছে। দুজনেরই মুখে হাসি। তারা পরস্পরের সঙ্গে খুব নিবিষ্টভাবে কথাবার্তা বলছে।

হারানচন্দ্র কাছে গিয়ে শুনলেন জটাই বলছে, "রামরাহা। খ্রাচ খ্রাচ।"

গর্ডন জবাব দিল, "র‍্যাডাক্যালি। খুচ খুচ।"

দুজনের কেউই হারানচন্দ্রকে বিশেষ পাত্তা দিল না। হারানচন্দ্রের মাথাটা ঘুরছিল। কোনওরকমে সামলে নিয়ে তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন।

দাদু ঘড়ি নিয়ে ফিরেছে, এতে লাটু নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। ঘড়িটা সম্পর্কে তার কৌতূহল বরং দশগুণ বেড়েছে। নিত্য দাসের কথায় একটু আভাস পেয়েছিল লাটু। তারপর জটাইদাদুর থানে যে কাণ্ড দেখল, তা কহতব্য নয়। সেখানে চুরুটের গন্ধ ছিল। অর্থাৎ জটাইদাদুর কাছে গর্ডনসাহেব গিয়েছিল অবশ্যই। এর পরই খবর পাওয়া গেল, গর্ডনসাহেব তার কুকুরগুলো সমেত অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ওয়ার্কশপে। সবচেয়ে বড় কথা হল, এইসব রহস্যজনক কাণ্ডের সঙ্গে ঘড়িটার কোথাও একটা যোগসূত্র থেকেই যাচ্ছে।

সুতরাং লাটু তক্কে তক্কে ছিল। আড়াল থেকে সে দাদু আর ঠাকুমার কথা সবই শুনেছে। দাদু যে ঘড়িটা লোহার আলমারিতে রেখে চাবি কোমরে গুঁজল, এটাও সে লক্ষ করেছে। অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর এখন ইস্কুলে লম্বা ছুটি। দুপুর আর কাটতেই চায় না। তবু মটকা মেরে পড়ে থেকে সে দুপুরটা কাটাল। হারানচন্দ্র যখন বিকেলে বেরোনোর জন্য তৈরি হতে উঠলেন, তখন সেও উঠে পড়ল।

একটা সুবিধে হল এই যে, হারানচন্দ্রের বড় ভুলো মন। কাপড় বদলানোর সময় চাবির গোছাটা যে টেবিলে রাখলেন, সেটা পরক্ষণেই বেমালুম ভুলে গেলেন। সুতরাং দাদু বেরিয়ে যাওয়ার পর লাটু গিয়ে টেবিলের ওপর চাবিটা পেয়ে আলমারি খুলে ঘড়িটা বের করল।

ঘড়িটা বেশ বড়সড়। সাধারণ ঘড়ির মতো নয়। দেখতে ভারী বিদঘুটে। বারোটার জায়গায় চব্বিশটা ঘর। তাছাড়া ডায়ালের ওপর আরও কয়েকটা ছোট ডায়াল এবং কাঁটা রয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সময়টা ধরতে পারল না লাটু।

কোনও রহস্যময় কারণে বাড়ির সব ঘড়িই দুপুর থেকে উল্টোবাগে চলছে। লাটুর দুই কাকা রজোগুণহরি আর বহুগুণহরি বার বার ঘড়িতে দম দিয়ে এবং মিলিয়ে কিছুই করতে পারছে না। শুধু দাদুর এই ঘড়িটা ঘড়ির মতোই সমানে চলছে বটে, কিন্তু ঘর বেশি থাকায় সময় ধরা যাচ্ছে না।

লাটুর একটা নিজস্ব টুল-বক্স আছে। তাতে খুদে স্ক্রু-ড্রাইভার, উকো, হাতুড়ি নানারকম যন্ত্রপাতি। বাক্সটা নিয়ে লাটু সোজা গিয়ে ঢুকল বড়কাকার ডার্করুমটায়।

ডার্করুমে ঢুকে লাটু দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর বাতি জ্বালানোর সুইচের দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু মজা হল, দরজা বন্ধ করার পর ডার্ক রুম যেরকম ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার কথা, তেমন অন্ধকার হয়নি। বেশ স্নিগ্ধ একটা আলোয় ঘরের সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

লাটু সুইচ টিপতে হাত বাড়িয়ে অবাক হয়ে থেমে চারদিক চেয়ে দেখতে থাকে। এই ডার্করুমে সে প্রায়ই ঢোকে এবং কাকার ফোটোগ্রাফির অনেক কাজে সাহায্য করে। কাজেই ঘরটা তার খুবই পরিচিত। এত আলো এ-ঘরে থাকার কথা নয়। এরকম আলোও লাটু কখনও দেখেনি।

চোখ কচলে লাটু ফের ভাল করে তাকাল। চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করল। আসলে আলোটা কীরকম তা সে বুঝতে পারল না। সূর্যের আলোর রং সাদা, ফ্লুরোসেন্ট বাতির রং নীলাভ, বাল্‌বের আলো হলুদরঙা। কিন্তু এই আলোটার কোনও রং নেই। এমন কী, আলোটা যে জ্বলছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এক আশ্চর্য কার্যকারণে ঘরের প্রত্যেকটা জিনিসই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

লাটু অবাক হল, একটা ভয়-ভয়ও করতে লাগল। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ খুব কাছ থেকে কে যেন বলে ওঠে, "ওরা সব পাজি লোক। ওরা সব পাজি লোক।"

লাটু এত চমকে ওঠে যে, হাত থেকে ঘড়িটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। ভাল ক্রিকেট খেলে বলে এবং কখনও ক্যাচ ফশকায় না বলে পড়ো-পড়ো ঘড়িটাকে ফের ধরে ফেলল সে। তারপর তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরোনোর চেষ্টা করতে গেল।

খুব মোলায়েম গলায় কে যেন ফের বলে ওঠে, "ভয় পেও না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

লাটুর বুকের ভিতরটায় দমাস-দমাস শব্দ হতে থাকে। গলা শুকিয়ে যায়। সে-চারদিকে চেয়ে কাউকেই দেখতে পায় না। হাত-পা ঝিমঝিম করছে ভয়ে। সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অশরীরী গলার স্বর ফের বলে ওঠে, "দরজার ছিটকিনিটা তুলে দাও।"

লাটুর হাত-পা যদিও ভয়ে কাঁপছে, তবু তার মনে হয়, এই আদেশ পালন না করলেই নয়। সে লক্ষ্মী ছেলের মতো ছিটকিনিটা তুলে দেয়।

ফের আদেশ হয়, "চেয়ারে বোসো।"

লাটু ডার্করুমের কাঠের চেয়ারটায় কাঠের পুতুলের মতোই বসে পড়ে।

"এবার ঘড়িটার দিকে তাকাও।"

লাটু হাতে ধরা ঘড়িটার কথা একদম ভুলে গিয়েছিল। ঘড়িটা তার মুঠোতেই ধরা রয়েছে। সে মুঠো খুলে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ভারী অবাক হয়ে যায়। ঘড়ির মস্ত ডায়ালটার চেহারা একদম পাল্টে গিয়েছে। কাঁটাগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। ঘড়ির কাঁচটা একদম ঘষা কাচের মতো অস্বচ্ছ। তবে কাঁচটা খুব উজ্জ্বল।

লাটু ঘড়িটার দিকে মুখ নিচু করে চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন নিবিষ্ট হয়ে পড়ে। তার মনে হয়, এক্ষুনি একটা কিছু ঘটবে। কী ঘটবে তা সে অবশ্য জানে না।

ঘড়ির উজ্জ্বল কাচটা ধীরে ধীরে হলুদ রং ধরল, ফের আস্তে আস্তে নীলচে হয়ে গেল, তারপর সাদাটে হতে লাগল।

লাটু হাঁ করে চেয়ে থাকে। একবার ভয়ে ঘড়িটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল, সেই অশরীরী স্বর সঙ্গে-সঙ্গে বলে ওঠে, "ফেলো না। তাকিয়ে থাকো। আমাকে দেখতে পাবে। ভয় নেই।"

"আপনি কে?"

"আমি? আমি একজন। চিনবে না।"

“আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?”

“অনেক দূর থেকে।”

“কত দূর?”

“সেটা তুমি ধারণাও করতে পারবে না।”

“আমি ভয় পাচ্ছি যে।”

“ভয় নেই। তুমি হবে আমার প্রতিনিধি।”

“প্রতিনিধি? কিসের প্রতিনিধি?”

“আমার প্রতিনিধি হয়ে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।”

“ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে বলছেন কেন?”

“আমাকে দেখতে পাবে। তাকিয়ে থাকো। আমার ছবি ফুটে উঠবে।”

লাটু তাকিয়ে থাকে। কয়েক সেকেন্ড বাদে ধীরে ধীরে ঘড়ির কাচে একটা মুখের আদল ফুটে উঠতে থাকে। ভারী অদ্ভুত মুখ। খুব লম্বা, গালভাঙা, কর্কশ একটা মুখ। চোখ দুটো গর্তের মধ্যে। মাথায় একটা হুডওলা টুপি কপাল ঢেকে আছে। মানুষেরই মুখ, তবে এরকম মুখ সচরাচর দেখা যায় না। অনেকটা আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো। তবে আরও ধারালো, আরও বুদ্ধিদীপ্ত। কিন্তু মুখটার মধ্যে একটা অমানুষিকতাও আছে।

লাটু ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে সম্মোহিতের মতো ঘড়ির পর্দায় চেয়ে থাকে।

ছবির মুখটা নড়ল এবং স্পষ্ট ও পরিষ্কার স্বর কানে এল লাটুর। “আমাকে দেখতে পাচ্ছ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“আমি তোমাদের ভাষা জানি না। আমি যে ভাষায় কথা বলছি সেটা কি তোমার ভাষা?”

“হ্যাঁ। আপনি বাংলা ভাষায় কথা বলছেন।”

লোকটা হাসল। বলল, “মোটেই নয়। আমি নিজের ভাষায় কথা বলছি। তবে একটা অনুবাদযন্ত্র আমার সব কথা তোমার ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছে। তোমাদের ভাষা শিখতে যন্ত্রটার বেশ সময় লেগেছে। এত বিদঘুটে ভাষা কেন তোমাদের?”

লাটু কী বলবে? সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুধু চেয়ে থাকে।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, “দাড়িওয়ালা ফর্সা আর লম্বা চেহারার যে লোকটার কাছে এ ঘড়িটা এর আগে ছিল, সে কে বলো তো!”

লাটু বলল, “গর্ডন সাহেব।”

“আর তার আগে লম্বা চুল আর দাড়িওলা লোকটা?”

“জটাই তান্ত্রিক।”

“ওরা কেমন লোক?”

“ভাল লোক।”

ছবির লোকটা হাসল। বলল, “ওরা দুজনেই আমাদের এই ঘড়িটা খুলবার চেষ্টা করেছিল।”

“তাই নাকি?”

“হ্যাঁ। কিন্তু ওটা খুব বিপজ্জনক। তুমি কখনও ঘড়িটা খুলবার চেষ্টা কোরো না। যদি করো তাহলে যন্ত্রই তার প্রতিশোধ নেবে। যেমন ওদের ওপর নিয়েছে।”

“ওদের কী হয়েছে?”

“খুব বেশি কিছু নয়। আমরা ওটাকে বলি যন্ত্র-সম্মোহন। আমাদের যন্ত্র ওদের সম্মোহিত করে রেখেছে। যতদিন সম্মোহন থাকবে, ততদিন ওরা আমাদের ভাষায় কথা বলবে, আমাদের যন্ত্র যে-রকম তরঙ্গ সৃষ্টি করবে, সেই রকমই চিন্তা করবে। ওদের নিজস্ব সত্তা থাকবে না।”

“সম্মোহন কাটবে না?”

“কাটবে। সে ব্যবস্থা আমরা করব। চিন্তা কোরো না। কিন্তু তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।”

“বলুন।”

“আমাদের হয়ে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।”

“কী কাজ?”

“আমাদের একজন লোক আমাদের সঙ্গে দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওই যে যন্ত্রটা তোমার হাতে রয়েছে, ওটা কিন্তু ঘড়ি নয়। অত্যন্ত জরুরি একটা যন্ত্র। বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য আবিষ্কার। ওই বিশ্বাসঘাতক যন্ত্রটি নিয়ে পালিয়ে যায়। সে গিয়ে তোমাদের পৃথিবীতে আশ্রয় নিয়েছে। তবে বুঝতে পারছি, পৃথিবীতে নামবার সময় সে কোনও দুর্ঘটনায় পড়ে, এবং যন্ত্রটি তার হাতছাড়া হয়ে যায়। নানা হাত ঘুরে এখন ওটি তোমাদের হাতে এসেছে। আমরা যন্ত্রটা ফেরত চাই।”

লাটু অবাক হয়ে বলে, “বেশ তো, ফেরত নিন। “

ছবির লোকটা হাসল। বলল, “অত সহজ নয়। আমরা এখন মহাকাশের যেখানে রয়েছি, সেখান থেকে তোমাদের গ্রহে পৌঁছোতে অন্তত সাত দিন লাগবে। ততদিনে ওই দুষ্টু লোকটা চুপ করে বসে থাকবে না। সে পাগলের মতো যন্ত্রটা খুঁজে বেড়াচ্ছে।”

লাটু ভয় পেয়ে বলে, "তাহলে কী হবে?"

"তুমি কি খুব ভিতু?"

"আমি ছোট্ট একটা ছেলে তো! গায়ে বেশি জোরও নেই।"

"আমরা ছোট ছেলেই তো চাই। এ-কাজ তোমাদের গ্রহের বড় মানুষেরা পারবে না। বড়দের মনে নানারকম সংশয়, সন্দেহ ইত্যাদি আছে। বাচ্চাদের ওসব নেই। এ-কাজে আমরা তোমাকেই নিয়োগ করছি। মাত্র সাত দিন লোকটার চোখে ধুলো দিতে হবে। তোমাদের পৃথিবীর দিনরাত্রির হিসেবে সাতটা দিন।"

"লোকটা কী করতে চায়?"

"লোকটা ওই যন্ত্রটা দখল করতে চায়। একবার হাতে পেলেই সে আমাদের নাগাল এড়িয়ে পালিয়ে যাবে। সে নানারকম প্রযুক্তি আর যন্ত্রবিদ্যা জানে। অসম্ভব ধূর্ত এবং নিষ্ঠুর। সে যে মহাকাশযানটি নিয়ে পালিয়ে

গেছে সেটিকে সম্ভবত তোমাদের কোনও সমুদ্রের গর্ভে লুকিয়ে রেখেছে। আমাদের সন্ধানী শব্দতরঙ্গ দিয়ে কিছুতেই সেটার হদিস করতে পারিনি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীতে নামবার সময় সে কোনও দুর্ঘটনায় পড়েছিল। ফলে ওই মহামূল্যবান যন্ত্রটা তার হাতছাড়া হয়। কিন্তু দুর্ঘটনা খুব গুরুতর নয়। সে বেঁচে আছে।"

"লোকটার নাম কী? দেখতে কেমন?"

"তার নাম অবশ্য সে পাল্টে ফেলেছে। তবে আমরা তাকে রামরাহা বলে ডাকি। দেখতে অনেকটা আমার মতো। কিন্তু সে ইচ্ছেমতো চেহারা পাল্টাতে পারে। তবু বলে রাখি, তোমাদের হিসেবে সে প্রায় ছ ফুট লম্বা। স্বাস্থ্য ভাল। সে ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে দৌড়োতে পারে। দশ ফুট উঁচু লাফ দিতে পারে, তোমাদের গ্রহের গড়পড়তা মানুষদের দশজনকে সে একাই কাবু করতে পারে। ব্রুস লি বা মহম্মদ আলি তার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু এসব তেমন বিপজ্জনক নয়। তার কাছে যে মারণাস্ত্র আছে, তা দিয়ে সে পৃথিবীকে একেবারে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দিতে পারে। তা ছাড়া তার বুদ্ধি ক্ষুরধার, বিজ্ঞান সে ভালই জানে। যে-কোনও বস্তুর অণুর গঠন বদলে দিয়ে সে অন্য বস্তু তৈরি করতে পারে। মাটিকে সোনা, জলকে পেট্রল বানানো তার কাছে ছেলেখেলা। তার কাছে আছে বিবিধ রশ্মি-যন্ত্র। অর্থাৎ সে নিজের চারধারে এমন রশ্মি সৃষ্টি করতে পারে যাতে তোমরা তাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু সে তোমাদের স্পষ্ট দেখতে পাবে। তোমাদের যেসব সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র আছে, অর্থাৎ বন্দুক, রিভলভার, মেশিনগান বা বোমা সেগুলো তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের তুলনায় সে অতিমানুষ। শারীরিক গঠন, বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা কোনওটাতেই তোমাদের কেউ তার একশো ভাগের এক ভাগও নও। যন্ত্রবিদ্যায় তোমরা তার হাঁটুর সমান।"

"তাহলে কী করে তার সঙ্গে পারব?"

"আবার বলছি, ভয় পেও না। ভয় পেলে বুদ্ধি স্থির থাকে না। আমাদের ধারণা, সে এখন তোমাদের কোনও সমুদ্রের গর্ভে তার মহাকাশযানে বিশ্রাম নিচ্ছে। হয়তো টুকটাক কিছু মেরামতও সেরে নিচ্ছে। তারপরই সে ওই যন্ত্রটার খোঁজে বেরোবে। যন্ত্রটা খুঁজে পেতে তার কোনও অসুবিধাই হবে না, কারণ ওই যন্ত্র সর্বদাই শক্তি বিকিরণ করছে আর তার কাছে আছে চমৎকার সন্ধানী যন্ত্র। তবে সে প্রথমেই দুম করে কিছু করে বসবে না। সে জানে, কোনও বিস্ফোরণ ঘটালে বা শব্দতরঙ্গ কিংবা রশ্মিযন্ত্র চালু করলে আমরা তার সন্ধান পেয়ে যাব, কাজেই সে স্বাভাবিক সব পন্থা নেবে। নানারকম বুদ্ধির চাল চালবে।"

"কিন্তু সে তো তাহলে জিতেই যাবে!"

"হয়তো জিতবে। তার তো জেতারই কথা। কিন্তু তোমার একটা বাড়তি সুবিধা আছে। সেটা হল তোমার হাতের ওই যন্ত্র। এই যন্ত্রকে তুমি সব কাজের কাজি বলতে পারো। আমাদের ভাষায় এর নাম বুত বুত। তুমি ওটার নাম দাও কাজি। যদি বুদ্ধি স্থির রাখতে পারো আর ভয় না পাও, তবে কাজি তোমাকে নানা উপায় বলে দিতে পারবে। কাজির মধ্যে আছে অফুরন্ত মগজ আর অনন্ত উদ্ভাবনীশক্তি যা আমাদেরও নেই। সুতরাং কাজির কথামতো যদি চলো তবে রামরাহা তোমাকে সহজে হারাতে পারবে না। এখন তুমি একটা কাজ করো। যত শিগগির পারো, গর্ডন সাহেবের ওয়ার্কশপে গিয়ে ঘাঁটি করো।"

"গর্ডনের ওয়ার্কশপ! ও বাবা! সেখানে যে অনেক কুকুর।"

"তাতে কী? কাজি কুকুরদের এমন শাসন করে রাখবে যে, তারা তোমার বশংবদ হয়ে থাকবে। তারাই পাহারা দেবে তোমাকে।"

"আর গর্ডন সাহেবের পিসি? সে যে ভারী ঝগড়ুটে!"

"কাজি এমন ব্যবস্থা করবে যে, পিসি ভুলেও ওয়ার্কশপের ধারেকাছে যাবে না। কুকুরেরা তাকেও তাড়া করবে।"

"কিন্তু ওয়ার্কশপে কেন?"

"ওয়ার্কশপই যে দরকার। গর্ডনের ওয়ার্কশপ আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। খুবই সেকেলে মান্ধাতার আমলের ব্যবস্থা। তবে গর্ডন কিছু উদ্ভট চিন্তা করেছিল। তার ফলে কতগুলো যন্ত্র সে আধখ্যাঁচড়া তৈরি করেছে। তুমি সেগুলো সম্পূর্ণ করে নিতে পারো।"

"আমি? আমি তো বিজ্ঞান কিছুই জানি না।"

"চিন্তা নেই। কাজি তো আছেই। তুমি শুধু তার কথামতো চললেই হবে।"

"একা থাকব ওখানে?"

"একদম একা। কাউকে সঙ্গে নিও না।"

"বাড়িতে কী বলে যাব?"

"যাহোক একটা কিছু বোলো। আমাদের বাড়ি নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। কাজেই তোমাদের ওসব সম্পর্কের কথা আমরা জানিই না।"

"তোমার মা বাবা দাদু নেই?"

লোকটা হাসল। বলল "আছে। কিন্তু আমরা তো তোমাদের মতো নই। আমরা অন্যরকম। সে-কথা থাক। কাজটা কি শক্ত মনে হচ্ছে?"

"ভীষণ শক্ত, ভীষণ বিপজ্জনক।"

"মাত্র সাতটা দিন আমাদের সহায় হও। তোমাদের স্বার্থেই। রামরাহা তো পৃথিবীকে ধ্বংসও করতে পারে!"

লাটু একটু ভাবল, তারপর বলল, "চেষ্টা করব।"

"শাবাশ! এই তো চাই! কাজিকে সবসময়ে কাছে রেখো। খুব লক্ষ করলে দেখবে ওর নানা জায়গায় খুব সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। ভাল করে দ্যাখো।"

লাটু ঘড়িটা খুব ভাল করে উল্টেপাল্টে দেখল। খুব সূক্ষ্ম কয়েকটা ফুটো নজরে পড়ল তার। বলল, "আছে। দেখলাম।"

লোকটা বলল, "একটা সরু তারের মুখ বা ছুঁচ হাতের কাছে রেখো। একটা ফুটোর ওপরে একটা কাটাকুটি দাগ আছে, সেটাতে যদি ওই তার বা ছুঁচ ঢুকিয়ে চাপ দাও তাহলে কাজি তোমাকে নানা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া শেখাবে। যে ছ্যাঁদায় ঢ্যাঁড়া আছে, তা তোমাকে শেখাবে লড়াইয়ের পদ্ধতি। যে ছিদ্রটার গায়ে একটা গোল মার্কা আছে তা যে-কোনও বস্তুকে খাদ্যে পরিণত করার বুদ্ধি দেবে। আরও আরও বহু গুণ আছে, কিন্তু সেগুলো তোমার জানার দরকার নেই। কাজিকে যেখানে রাখা হবে, তার আশপাশের অন্তত দেড়শো গজের মধ্যে একটা আলাদা অদৃশ্য শক্তির ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যাবে। আলোর প্রতিফলনে বাধা আসবে, ঘড়ি চলবে উল্টো দিকে। কাজেই উদ্ভট কিছু দেখে প্রথমেই ভয় পেও না।"

লাটু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বলল "ওঃ, তাই ওরকম সব হচ্ছিল!"

“এবার বুঝেছ?”

“হুঁ।”

“তাহলে লক্ষ্মী ছেলের মতো যা বলেছি কোরো। রামরাহাকে তুমি হারাতে পারবে না বটে, কিন্তু সাতটা দিন যদি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারো, তাহলেই যথেষ্ট।”

“আপনি এখন কোথায় আছেন?”

“বললাম তো! অনেক দূরে। এখান থেকে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ বা আলো তোমাদের গ্রহে পৌঁছতে অনেক সময় নেয়।”

“তাহলে আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি কী করে?”

“এ হচ্ছে মেকানিক্যাল টেলিপ্যাথি। তোমরা বুঝবে না। যন্ত্রের সঙ্গে মানসিক ক্রিয়ার এক জটিল সমন্বয়। আমরা আলো বা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভের গতির চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতবেগে বার্তা পাঠাতে পারি।”

লাটু দেখল কাজির কাচ থেকে ছবিটা মুছে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

লোকটা হাত তুলে বলল, “বিদায়। আবার দেখা হবে।”

“আপনার নাম কী?”

“খ্রাচ খ্রাচ। সাবধানে কাজ কোরো। ভয় পেও না। বুদ্ধি যেন স্থির থাকে।”

বলতে বলতেই খ্রাচ খ্রাচের ছবি মিলিয়ে গেল। লাটু হতভম্ব হয়ে বসে ভাবতে লাগল, ঘটনাটা সত্যি না স্বপ্ন!

গর্ডন সাহেবের ওয়ার্কশপে গিয়ে কয়েকদিন থাকা লাটুর পক্ষে খুব সহজ নয়। বাড়ি থেকে তাকে ছাড়বে কেন? যদি পালিয়ে যায়, তবে সাঙ্ঘাতিক হৈ-চৈ পড়ে যাবে, কান্নাকাটি শুরু হবে। সুতরাং পালানো উচিত নয়। তাহলে কী করা?

লাটু খানিকক্ষণ ভাবল। হঠাৎ হাতে ধরা যন্ত্রটার দিকে নজর পড়ায় সে একটু নড়েচড়ে বসে। কাজিকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়ে যায়। তাই না? সমস্যা হল, কাজি বাংলা ভাষা বোঝে কি না এবং জবাবটাও বাংলায় দেবে কি না।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। অত ভাবনায় কাজ কী? জিজ্ঞেস করলেই তো হয়।

লাটু কাজির ডায়ালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “সব তো বুঝতে পারছ। এখন বলো তো কী করব?”

কাজির কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না।

লাটু তার টুল-বক্স থেকে একটা ইলেকট্রিক তার বের করে একটু তামার সুতো ছিঁড়ে নিল, তারপর কাজির একটা সূক্ষ্ম ফুটোয় তারটা ঢুকিয়ে সামান্য চাপ দিয়ে আবার প্রশ্নটা করল। এবার আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল একটা।

কাজি ভারী বিরক্ত হয়ে বলে, "ভুল ফুটোয় চাপ দিয়েছ। একটা ত্রিভুজ মার্কা ফুটো আছে দেখ। ওটায় তার ঢোকাও।"

হতভম্ব লাটু তা-ই করল।

এবার কাজি বলল, "মামাবাড়ি যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে পড়ো।"

লাটুর বিস্ময় আর ধরে না। বাস্তবিকই তার খেয়াল ছিল না যে, মামাবাড়ির নাম করে বেরিয়ে পড়া যায়। বেশি দূরও নয়। দুই স্টেশন। সেখানে একজন গুণী লোক চমৎকার লাটাই বানায়। সেই লাটাই আনতে যাওয়ার একটা কথাও ছিল বটে।

লাটু কাজিকে নিজের টুলবক্সে লুকিয়ে রেখে মায়ের কাছে গেল।

"মা, আমি একটু মামাবাড়ি যাব।"

"মামাবাড়ি! হঠাৎ কী মতলব।"

"বাঃ, লাটাই আনতে যাওয়ার কথা ছিল না?"

মা আর বিশেষ আপত্তি করলেন না, শুধু বললেন, "দাদু আর ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করে তবে যাস।"

লাটু যখন দাদুর ঘরে গিয়ে ঢুকল তখন আলমারির দরজা হাট করে খোলা আর তার সামনেই বাসবনলিনী এবং হারানচন্দ্রের মধ্যে তুলকালাম হচ্ছে। বাসবনলিনী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন, "ফের ঘড়ি হারিয়েছ আর বলছ আলমারিতে রেখেছিলে! রেখেছিলে তো গেল কোথায় শুনি! কী সুন্দর ঘড়ি! ঘড়িকে ঘড়ি, তার সঙ্গে আবার রেডিও লাগানো। আর কি সে জিনিস পাওয়া যাবে? পই-পই করে বললাম-"

এই গোলমালের মধ্যেই লাটু দাদুকে জিজ্ঞেস করল, "যাই দাদু?"

হারানচন্দ্র বিরক্ত হয়ে বললেন, "যা না!"

লাটু ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করে, "যাই ঠাকুমা?"

"তাড়াতাড়ি ফিরিস ভাই।"

লাটু এক লাফে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কয়েকটা জামাকাপড় গুছিয়ে একটা ব্যাগে ভরে নিল। পরদিন ভোরবেলা মামাবাড়ি যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে সে গিয়ে গর্ডনের বাড়ির পাঁচিল টপকে ওয়ার্কশপে ঢুকে পড়ল।

গর্ডনের কুকুরগুলো জেগে উঠেছে বটে, কিন্তু সব কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন অবস্থা, তাকে দেখেও গা করল না।

ত্রিভুজ মার্কা ফুটোয় তার ঢুকিয়ে লাটু কাজিকে বলল, "কুকুরগুলোকে চাঙ্গা করে তোলো। ওরা আমাদের পাহারা দেবে।"

একথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে কাজির ভিতরে একটা অদ্ভুত রিনরিনে শব্দ-তরঙ্গ উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কুকুরগুলো সেই শব্দের প্রভাবে হঠাৎ চনমনে হয়ে লাফ দিয়ে উঠে চারদিকে প্রচণ্ড দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দেয়। তারপর এসে লাটুকে ঘিরে ধরে প্রবলভাবে ল্যাজ নাড়তে থাকে।

লাটু গম্ভীর হয়ে কুকুরগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, “বেশ ভাল করে চারদিক নজর রাখবি, বুঝলি! এখন যা। “

সঙ্গে-সঙ্গে কুকুরগুলো বেরিয়ে গিয়ে গোটা ওয়ার্কশপটাকে প্রায় ঘিরে ফেলে পাহারা শুরু করে দেয়।

লাটু এবার ওয়ার্কশপটা পরীক্ষা করে দেখে। গর্ডন সাহেবের এই বিটকেল ওয়ার্কশপে কাজের ও অকাজের হাজার রকম যন্ত্রপাতি রয়েছে। লাটু তার অধিকাংশই চেনে না। আছে নানারকম রাসায়নিক দ্রব্যও। গর্ডনসাহেব যে উড়ুক্কু মোটর সাইকেল তৈরি করছিল সেটা একটা বড়সড় মজবুত ডাইনিং টেবিলের ওপর দণ্ডায়মান। মোটর সাইকেলের গায়ে একটা প্লেট দাঁড় করানো। তাতে চক দিয়ে লেখা ফুয়েল চার্জড। অলমোস্ট রেডি ফর ফ্লাইং। ওনলি ওয়ান থিং মিসিং। অর্থাৎ সব কিছুই প্রস্তুত, মোটর সাইকেল উড়বার জন্য তৈরি। শুধু একটা জিনিসের অভাবেই সেটা হচ্ছে না।

কিন্তু জিনিসটা কী?

লাটু কাজির বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার ছিদ্রে তারটা ঢুকিয়ে সমস্যাটা জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, “জিনিসটা কী কাজি?”

কাজি বলল, “খুব দুর্লভ জিনিস নয়। রাসায়নিকের তাকে দ্যাখো, একটা নীল রঙের শিশি আছে। তার গায়ে লেখা ‘পয়জন’। খুব সাবধানে ফুয়েল ট্যাংকের মধ্যে ঠিক চার ফোঁটা ফেলে দাও।”

লাটু দিল।

“এবার কী করব কাজি?”

“সিটে উঠে বোসো। স্টার্টারে খুব আস্তে চাপ দাও। কোনও শব্দ হবে না, কিন্তু একটা জোর হাওয়া বেরোবে।”

“তারপর?”

“খুব সোজা। মোটর সাইকেলটা শূন্যে ভাসবে। বাঁ হাতের হাতলটা নিজের দিকে একটু ঘুরিয়ে দিলেই চলতে থাকবে। বেশি ঘোরালে স্পিড বাড়বে।”

লাটু খুব ভয়ে ভয়ে সিটে উঠে বসে স্টার্টারে একটা পা ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই মোটর সাইকেলটা থরথর করে কেঁপে উঠল। একজস্ট পাইপ দিয়ে প্রবলবেগে হাওয়া বেরোনোর মৃদু শব্দ টের পেল সে। তারপরই প্রকাণ্ড মোটর সাইকেলটা ধীরে ধরে শূন্যে উঠে ভাসতে লাগল।

“কাজি!” আতঙ্কে চেঁচায় লাটু।

“ভয় নেই। হাতলটায় চাপ দাও।”

লাটু অবাক ভাবটা সামলে নিতে কিছুক্ষণ সময় নিল। তারপর কাজির কথামতো কাজ করতেই মোটর সাইকেল ধীরে ধীরে শূন্যে চলতে থাকে। লাটুর চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া। এত অবাক হয়ে গিয়েছিল সে যে, সময়মতো দিক পরিবর্তন না করায় মোটর সাইকেলটা গিয়ে একটা দেয়ালে মৃদু ধাক্কা খায়।

কাজি বিরক্ত হয়ে বলে, “অ্যাকসিডেন্ট হবে যে! এত অবাক হওয়ার কী আছে? এ তো একেবারে প্রাথমিক জিনিস?”

লাটু হাঁ হয়ে বলে, “প্রাথমিক বিজ্ঞান?”

"তা ছাড়া কী? তোমরা এখনও বিজ্ঞানের অন্ধকার যুগে পড়ে আছ। আকাশে উড়তে এখনও তোমাদের এরোপ্লেন, হেলিকপটার বা রকেটের মতো সেকেলে জিনিস লাগে। আমাদের দেশের মানুষেরা স্রেফ একটা কলমের মতো যন্ত্রের সাহায্যে উড়ে যেতে পারে।"

"বলো কী?"

"ঠিকই বলছি। এখন সাবধান হও, নইলে আবার ধাক্কা খাবে। দরজা খোলা রয়েছে, হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে দিয়ে বাইরে চলো।"

লাটু উড়ুক্কু মোটর সাইকেলে বাইরে বেরিয়ে এল। বিস্তর গাছপালা-ছাওয়া বিশাল বাগান। দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে থাকে। আজ উড়ুক্কু মোটর সাইকেলে চেপে লাটু গাছপালার ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এরকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তার জীবনে হয়নি। কী মজা!

"স্পিডটা একটু বাড়াব কাজি?"

"বাড়াও। তবে সাবধান, পড়ে যেও না। শক্ত করে ধরে থাকো।"

লাটু স্পিড বাড়াল। মোটর সাইকেল প্রবল বেগে বাগানের ওপর চক্কর দিতে লাগল।

ওয়ার্কশপে ফিরে এসে মোটর সাইকেল যথাস্থানে রেখে লাটু অন্য সব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে লেগে গেল। সুবিধের জন্য কাজিকে সে বাঁ হাতের কব্জিতে ঘড়ির মতো বেঁধে নিয়েছে। কাজি নানারকম নির্দেশ দেয়, আর লাটু অদ্ভুত অদ্ভুত সব যন্ত্র তৈরি করে ফেলতে থাকে। আসলে নতুন কিছুই নয়। গর্ডনের আধাখ্যাঁচড়া জিনিসগুলিকেই সম্পূর্ণ করে সে।

গর্ডন একটা যন্ত্রমানব তৈরি করেছিল। বাইরেটা বেশ হয়েছে, কিন্তু স্লেটে লেখা ছিল এভরিথিং কমপ্লিট, বাট দি ফুল ডাজন্‌ট মুভ। ইট ওনলি মুভস ওয়ান অফ ইটস হ্যান্ডস অ্যান্ড স্ল্যাপ্‌স্ মি ফ্রম টাইম টু টাইম। অর্থাৎ, সবই হয়েছে, কিন্তু বোকাটা তবু নড়ে না। মাঝে মাঝে শুধু একটা হাত নাড়ে আর আমাকে চড় কষায়। এই যন্ত্রমানবটা লাটুর হাতে পড়ে দিব্যি চলতে ফিরতে পারল এবং টুকটাক কাজও করতে লাগল।

ছোট একটা ট্রাঙ্কের মতো বাক্স বানিয়েছে গর্ডন। তার গায়ে লেখা: প্যাণ্ডোরাজ বক্স। ইট ইজ সাপোজড টু ক্রিয়েট স্টর্ম। বাট দি গড্যাম থিং ওনলি ক্রিয়েটস এ হেল অব এ নয়েজ। অর্থাৎ, এ-বাক্সটার ঝড় সৃষ্টি করার কথা ছিল। কিন্তু এই কিম্ভূতটা শুধু বিকট শব্দ করে। লাটু কাজির পরামর্শ মতো বাক্সটাও সম্পূর্ণ করে ফেলল। একটা বোতাম টিপতেই চারধারে গাছপালার মড়মড় শব্দ তুলে ছোটখাটো একটা ঝড় উঠতেই লাটু তাড়াতাড়ি লাল বোতাম টিপে ঝড় থামাল।

কাজি একটু হেসে বলে, "অনেক কিছু তো তৈরি করলে, কিন্তু রামরাহার সঙ্গে লড়ার অস্ত্র কই তোমার? এসব ছোটখাটো খেলনা দিয়ে কী হবে?"

লাটু ভাবনায় পড়ল। খ্রাচে খ্রাচের কাছে সে যা শুনেছে, তাতে রামরাহা প্রায় অপ্রতিরোধ্য এক শক্তিমান লোক। তাকে ঠকানোর মতো কিছুই তার জানা নেই। রামরাহা শুধু যে ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে দৌড়োয়, দশ ফুট হাইজাম্প দেয় আর মহম্মদ আলি এবং ব্রুস লি'কে দুহাতে নিয়ে লোফালুফি করতে পারে তাই নয়, বুদ্ধি এবং প্রযুক্তিতেও সে বহু বহু গুণ শক্তিশালী।

লাটু বলে, "কী করব তাহলে কাজি?"

কাজি একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করে বলে, "ভেবে দেখি। রামরাহার বুদ্ধি এমন এক স্তরের যে, তাকে হারাতে হলে অতি মগজ দরকার। অনেক ভাবতে হবে।"

লাটুও ভাবে।

আস্তে আস্তে রাত হতে থাকে। গর্ডনের ওয়ার্কশপটা ভারী নির্জন হয়ে যায়। লাটু বলতে গেলে একা। কাজি আছে বটে, কিন্তু সে তো পুঁচকে একটা যন্ত্র মাত্র। কুকুরগুলোকেও সঙ্গী হিসেবে ধরা যায় না। লাটু তার দাদুর অন্ধ সমর্থক। সেও দাদুর মতো ভূত বিশ্বাস করে না, ভগবান মানে না। কিন্তু সন্ধের পর গা ছমছম করেই। আর পরীক্ষার সময় ঠাকুর-দেবতাকে অগ্রাহ্য করতে কেমন যেন সাহস হয় না। ওয়ার্কশপের নির্জনতায় তার একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। বাগানের গাছপালায় নানারকম শব্দ হচ্ছে। দূরে শেয়াল হাঁক মারছে। সেই শুনে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ছুটে যাচ্ছে। তারের বাজনার মতো ঝিঁঝি ডেকে যাচ্ছে একটানা।

লাটু একটু ফাঁকা গলায় ডাকল, "কাজি!"

"বলো।"

"তুমি কি ভূত মানো?"

"কেন মানব না?"

"ভূত কি সত্যিই আছে?"

কাজি খিকখিক করে একটু হেসে বলে, "তোমাদের বিজ্ঞান এখনও এত পিছিয়ে আছে যে বলার নয়। আমাদের ওখানে তো ভূতের একটা চমৎকার লাইব্রেরিই আছে। থাকে-থাকে খোপে-খোপে হাজার রকমের ভূত। ভূতেরা সেখানে নানারকম কাজও করে দেয়।"

লাটু কেঁপে উঠে বলে, "ইয়ার্কি করছ না তো কাজি? সত্যিই ভূত আছে?"

কাজি ফের একটু ঠাট্টার হাসি হাসল। বলল, "তোমাদের এখানকার ভূতদের আমি ঠিক চিনি না বটে, কিন্তু তারা যে আছে তা আমার ট্রেসারে ধরা পড়ছে। যে ফুটোটায় মড়ার খুলির চিহ্ন আছে সেটাতে তারটা ঢোকাও তো।"

লাটু বলল, "থাক। কাজ নেই।"

কাজি মোলায়েম গলায় বলে, "আমি তো আছি, ভয় কী? ঢোকাও।"

খুব ভয়ে ভয়ে লাটু তারটা নির্দিষ্ট ফুটোয় ঢুকিয়ে দিল, কাজিকে অমান্য করতে সাহস পেল না। যদি বিগড়ে যায়?

তারটা ঢোকানোর পরই ঘরে যে দুটো ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছিল সেগুলো কেমন যেন একটা অদ্ভুত লাল-বেগুনি রং ধরতে লাগল। ঘরটা হয়ে উঠতে লাগল থমথমে। খুব আস্তে-আস্তে—ফিসফিস কথার মতো, বেড়ালের পায়ের শব্দের মতো—কী সব শব্দ হতে লাগল চারদিকে।

কাজি নিচু স্বরে বলল, "আমার ভূত-চুম্বকটা চালু করে দিয়েছি। এবার দ্যাখো কী মজা হয়।"

"আমার মজা লাগছে না। ভয় লাগছে।"

"আরে দূর! ভূতকে ভয় কী? দেখো চেয়ে। ওই একটা ঢুকেছে।"

প্রথমটায় লাটু দেখতে পায় না। তারপর ঘরের চালের কাছ থেকে একটা স্প্রিঙের মতো জিনিসকে ঝুল খেতে দেখে।

"বাবা গো! ওটা কী কাজি?"

"প্যাঁচ-খাওয়া চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না?"

"না।"

"ভূত হল মানুষের মানসিক-আত্মিক একটা অস্তিত্ব। মানুষের মন আর চরিত্র জ্যান্ত অবস্থায় যেমন ছিল মরার পর তার ভূতের চেহারাটা ঠিক সেরকম হয়ে যায়। ওই ভূতটা জ্যান্ত অবস্থায় ছিল ভারী প্যাঁচালো স্বভাবের, খুব কুটিল আর ধূর্ত।"

"বুঝেছি। আর ওই যে একটা লালমতো জোঁক তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে?"

"ওটা ছিল এক ঝগড়াটি মহিলা।"

নানান চেহারার অজস্র ভূত ঘরে বিচরণ করছে। কেউ কেউ টুপটাপ করে চাল থেকে খসে পড়ছে, কেউ বাতাসে সাঁতার কাটছে, কেউ মেঝেয় পড়ে বলের মতো লাফিয়ে উঠছে। নানান চেহারা, হরেক রং তাদের। একখানা ভূতকে দেখল লাটু, অবিকল একখানা বই। কাজি বলল, "এ লোকটা নাকি ছিল বইয়ের পোকা আর ভারী পণ্ডিত। বই পড়তে পড়তে বই হয়ে গেছে।"

লাটু কাজির ফুটো থেকে তারটা খুলে নিয়ে বলল, "আর নয়। একদিনে যথেষ্ট ভূত দেখা হয়েছে।"

ঘরের থমথমে ভুতুড়ে ভাবটা মিলিয়ে গেল। ভুতগুলোও আর রইল না।

কাজি বলল, "ভূতের ভয় ভেঙেছে তো!"

লাটু একগাল হেসে বলল, "ভেঙেছে কি না বলতে পারব না। তবে তেমন ভয় করছে না।"

কাজি এবার হুকুমের স্বরে বলল, "এবার ওঠো। অনেক রাত হয়েছে। ঘরের কোণে গর্ডনের মস্ত ফ্রিজ রয়েছে। তাতে ঠাসা খাবার। বের করে গ্যাস-উনুনে গরম করে খেয়ে নাও।"

লাটু, তাই করল।

কাজি হুকুম করল, "এবার ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বোজো। আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। আর শোনো, আমার ট্রেসারে এখনও রামরাহার কোনও নড়াচড়া টের পাচ্ছি না। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এলে আমি তার গায়ের গন্ধ পাব। পেলেই তোমাকে জাগিয়ে দেব। নিশ্চিন্তে ঘুমোও।"

লাটুর ঘুম ভাঙল সকালবেলায়। শরীর বেশ তাজা আর ঝরঝরে লাগছে। আসন্ন বিপদের কথা মনে থাকলেও বেশ স্ফূর্তি লাগছে তার।

দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে, বাথরুম সেরে এবং ফ্রিজের খাবার ভরপেট খেয়ে সে উড়ুক্কু মোটর সাইকেলে চড়ে বাগানের ওপর কয়েকটা চক্কর দিল। কলের মানুষটাকে দিয়ে ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করাল। সামান্য একটু ঝড় তুলে মজা দেখল।

কাজি আজ বেশি সাড়াশব্দ করছে না। ঝিম মেরে আছে।

লাটু বলল, "কী গো কাজি? চুপচাপ যে!"

"রোসো। পশ্চিম দিকটায় ভারত মহাসাগর আছে না তোমাদের! সেখানে একটা কিছু ঘটছে।"

লাটু সভয়ে বলে, "কী ঘটছে?"

"এখনও বুঝতে পারছি না। আমার ট্রেসারে অন্য একটা ট্রেসারের ছায়া পড়ে কাটাকুটি হয়ে যাচ্ছে। খুব উন্নত ধরনের ট্রেসার সেটা। তোমাদের পৃথিবীর তৈরি জিনিস নয়। মনে হচ্ছে সমুদ্রের তলায় রামরাহা নড়াচড়া শুরু করেছে।"

"তাহলে?"

"তাহলে আর কী? লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও।"

"কিন্তু কী দিয়ে লড়ব? আমার যে একটা বন্দুকও নেই।"

"বন্দুক! হাঃ হাঃ! বন্দুক কেন, কামান বা অ্যাটমবোমাও রামরাহার কাছে কোনও অস্ত্রই নয়। ওসব ভেবে লাভ নেই। আমি অবশ্য একটা কাউন্টার এনার্জি ফিল্ড তৈরি করে দিচ্ছি। তার ফলে রামরাহার ট্রেসার প্রথম

চেষ্টায় আমার অবস্থান ধরতে পারবে না। কিন্তু চালাকিটা বেশিক্ষণ টিকবে না।”

“আমার যে মাথায় কোনও বুদ্ধিও আসছে না।”

“ঠিক আছে। তুমিও ভাবো, আমিও ভাবি। একটা দুঃখের কথা তোমাকে এখনই বলে রাখি লাটু। আমি এখন তোমার হয়ে লড়ছি বটে। কিন্তু আমি তো আসলে যন্ত্র। যন্ত্রের কোনও পক্ষপাত থাকে না। রামরাহা যদি আমাকে হাতে পেয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমি তোমার বিরুদ্ধেই লড়াই করব।”

“বলো কী কাজি?”

“বললাম না, দুঃখের কথা! তাই বলি, হাতছাড়া কোরো না।”

পাঞ্জাব মেল মোগলসরাই স্টেশন সবে ছেড়েছে, এমন সময় ফার্স্ট ক্লাস কামরায় এক ভদ্রমহিলা আর্তনাদ করে উঠলেন, “আমার হারটা! ওগো, আমার হারটা যে ছিঁড়ে নিয়ে গেল! কী হবে!”

ভদ্রমহিলার স্বামী মাঝবয়সী নাদুস-নুদুস ভিতু চেহারার একজন লোক। তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, “নিয়ে গেল! অ্যাঁ! কী সর্বনাশ! সোনার ভরি যে এখন প্রায় দু হাজার টাকা যাচ্ছে! চেন টানো! চেন টানো!”

উল্টোদিকে জানালার কাছ ঘেঁষে একজন লম্বাচওড়া যুবক চুপচাপ বসে ছিল এতক্ষণ। ঠিক চুপচাপ নয়, মাঝে-মাঝে সে একটা অদ্ভুত সুরে শিস দিচ্ছিল। যুবকটি ছ ফুটের ওপর লম্বা, দারুণ স্বাস্থ্য এবং দেখতে ভীষণ রকম সুপুরুষ। সে একটা খবরের কাগজ পড়ার চেষ্টা করছে আর আড়ে-আড়ে দেখছে সবাইকে।

মাঝবয়সী ভদ্রলোক চেন টানার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন, যুবকটি হঠাৎ বলল, “গাড়ি থামালেও কি জিনিসটা পাবেন?”

লোকটা থমকে গিয়ে ইতস্তত করে বলে, “তা পাব না ঠিকই। বরং আড়াইশো টাকা জরিমানা গুনতে হবে। জেলটেলও হতে পারে। কিন্তু কিছু তো করতে হবে।”

যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “ট্রেন থামালে আমার অসুবিধা হবে। আমি একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি। তার চেয়ে ট্রেনটা চলুক, হার আমি এনে দিচ্ছি।”

“আপনি এনে দেবেন! বলেন কী? ট্রেন এখন স্পিড দিয়ে দিয়েছে যে!”

“কোনও চিন্তা নেই।” বলেই যুবকটি করিডোরে বেরিয়ে গেল। তারপর দরজা খুলে প্রায় চল্লিশ মাইল বেগের ট্রেন থেকে অনায়াসে নেমে গেল। ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা আর একজন অবাঙালি যাত্রী ভয়ে কাঠ হয়ে জানালা দিয়ে চেয়েছিলেন। ছেলেটা হাড়গোড় ভেঙে দ হয়ে গেল নাকি!

কিন্তু ঠিক দশ মিনিটের মাথায় দেখা গেল, ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি লোক লাইনের ধার ধরে দৌড়ে আসছে। ট্রেনের গতি আরও বেড়েছে। বোধহয় ঘণ্টায় ষাট মাইল। কিন্তু লোকটা অনায়াসে কামরাগুলোকে

পিছনে ফেলে ফার্স্ট ক্লাসের দরজার হ্যান্ডেল ধরে লাফিয়ে উঠে পড়ল। কামরায় ঢুকে একমুখ হেসে হারটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "লোকটা বেশি দূর যেতে পারেনি। নদীর ওপর একটা ব্রিজ আছে, সেখানে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে বসে যাচ্ছিল। নিন।"

ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা এবং কামরার আর একজন অবাঙালি যাত্রী এত অবাক হয়ে গেলেন যে, কথা বলতে পারলেন না।

যুবকটি অবশ্য কিছুই তেমন গ্রাহ্য করল না। একটু হাঁফাচ্ছিলও না সে। ফের নিজের জায়গায় বসে সেই অদ্ভুত সুরে শিস দিতে লাগল।

রাত একটু গভীর হল। সহযাত্রীরা বিছানা-টিছানা পাতছে। এমন সময় আচমকা কামরার দরজাটা দড়াম করে খুলে চার-পাঁচজন ভয়ংকর চেহারার লোক ঢুকল। হাতে রিভলভার, ছোরা, স্টেনগান।

ঢুকেই তারা হিন্দিতে ধমক দিয়ে বলল, "কেউ নড়বে না, চেঁচাবে না। একদম জানে মেরে দেব!"

সকলেই হতভম্ব, ভয়ে হাত পা কাঁপছে। শুধু যুবকটি একটু অবাক হয়ে মাঝবয়সী ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে, "এরা কারা? এরকম করছে কেন?"

"বুঝছেন না মশাই!" ভদ্রলোক কাঁপতে কাঁপতে বলেন, "ডাকাত!"

"ডাকাত! সে আবার কী?"

"মেরেধরে কেড়েকুড়ে নেবে সব। যা আছে দিয়ে দিন যদি প্রাণে বাঁচতে চান।"

যুবকটি খুব অবাক ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ডাকাতদের দিকে। ডাকাতরা তখন উদ্দাম উল্লাসে ভদ্রমহিলার হাত থেকে চুড়ি খুলবার চেষ্টা করছে, বাক্স ভাঙছে।

যুবকটি উঠে একজন ডাকাতকে একটা চড় মারতেই সে ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আর একজন ডাকাত যুবকটির বুকে নল ঠেকিয়ে পিস্তলের ঘোড়া টানল। আর একজন হাতের ছোরা খচ করে বসিয়ে দিল যুবকের পেটে।

যে কারও এতে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে মরে যাওয়ার কথা। কিন্তু সকলে অবাক হয়ে দেখে, পিস্তলের গুলিটা ছিটকে গেল তার বুকে ধাক্কা খেয়ে। ছোরার ডগাটা ভেঙে পড়ে গেল মেঝেয়। পরের কয়েক সেকেন্ড সময় কাটল শুধু একতরফা মারে। পাঁচজন ডাকাত পাঁচ সেকেণ্ডে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। যুবকটি তাদের দেহ একসঙ্গে দু বগলে তুলে নিয়ে করিডরের এককোণে রেখে এসে ফের সেই অদ্ভুত শিস দিতে লাগল।

মাঝবয়সী ভদ্রলোক আর থাকতে পারলেন না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে বলুন তো!"

যুবকটি হেসে বলে, "আমার নাম রামচন্দ্র রাহা।"

"থাকেন কোথায়?"

"একটু দূরে।"

"যাচ্ছেন কোথায়?"

রাম কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি একটা জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সেটা যে ঠিক কোথায় আছে, সেটাই ধরা যাচ্ছে না।"

এইসব রহস্যময় কথাবার্তা শুনে ভদ্রলোক আর দ্বিরুক্তি করলেন না।

সকলে বিছানা-টিছানা পেতে শুয়ে পড়তেই রামচন্দ্র তার শিসের সুর পাল্টে ফেলল। এবার যে সুরটা সে বাজাচ্ছিল, সেটা বড় মাদকতাময়। শুনতে শুনতে ঝিম ধরে যায়, ঘুম পেয়ে যায়।

অল্প সময়ের মধ্যেই তিনজন সহযাত্রী গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। রামচন্দ্র তার পকেট থেকে একটা চৌকোনো যন্ত্র বের করে নানারকম সুইচ আর নব টিপে এবং ঘুরিয়ে কী যেন দেখল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "র‍্যাডাক্যালি! র‍্যাডাক্যালি!" আবার কিছুক্ষণ যন্ত্রটা নাড়াচাড়া করল সে। তারপর বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে আপনমনে বলল, "হিমালয়! হিমালয়!"

একটা জংশন স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই রামচন্দ্র তার স্যুটকেসটা নিয়ে নেমে পড়ল।

* * *

কাজি আচমকা বলে উঠল, "শোনো লাটু! রামরাহা আসছে।"

"আসছে!" লাটু মাঝরাতে ঘুম ভেঙে তড়াক করে উঠে বসে।

কাজি বলে, "আসছে বটে। তবে আমি তাকে একটু দিকভ্রান্ত করে দিতে পেরেছি। সে আমার অবস্থান বুঝতে পারছে না। কলকাতার দিকে আসতে আসতে সে তাই মাঝপথে এক জায়গায় নেমে পড়েছে।"

"এরপর রামরাহা কী করবে?"

"খুব সম্ভব সে হিমালয়ের দিকে যাবে। আমি তাকে ওই দিকেই যেতে বাধ্য করেছি। তবে ভুলটা ধরা পড়তে তার বেশিক্ষণ লাগবে না।"

লাটু শিউরে উঠে চোখ বোজে। তারপর খুব ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করে, "কাজি, রামরাহা লোকটা কি খুবই ভয়ংকর?"

কাজি একটু চুপ করে থেকে বলে, "হ্যাঁ, শত্রু হিসেবে ভয়ংকর।"

"সে কি তোমার জন্য আমাদের খুন আর পৃথিবী ধ্বংস করবে?"

কাজি আবার একটু চুপ করে থেকে ধীর স্বরে বলল, "ইচ্ছে করলে সে পারে।"

লাটু হাল ছেড়ে ফের ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল।

কাজি বলল, "রামরাহা এখন কোথায় জানো?"

"না। বলো তো কোথায়?"

"একটা শহর ছেড়ে সে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটছে। সামনেই খাড়া পাহাড় এবং গিরিপথ। তারপরই তুষাররাজ্য। রামরাহা ভ্রূকুটি করছে, ঠোঁট কামড়াচ্ছে, সন্দেহ দেখা দিয়েছে তার মনে। সে ট্রেসার যন্ত্র বের করে আবার কিছু দেখে নিচ্ছে... না, সে এগিয়ে যাচ্ছে।...আপাতত কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত।"

* * *

রামচন্দ্র রাহা নামক সেই যুবকটি অত্যন্ত সংকীর্ণ একটা গিরিপথ দিয়ে এগোচ্ছিল। বাঁয়ে খাড়া পাহাড়ের দেয়াল, ডাইনে অতলগভীর খাদ। রাস্তা ভাঙা, এবড়োখেবড়ো, ভাল করে পা রাখার জায়গা নেই, তার ওপর বড্ড খাড়াই।

কিন্তু রামচন্দ্রের হাঁটা দেখে মনে হয়, তার বিশেষ কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বেশ লঘু দ্রুত পায়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে।

পাকদণ্ডির শেষ। সামনে একটা মস্ত উপত্যকা। পুরোটা পুরু বরফে ঢেকে আছে। শোঁ শোঁ করে তুষার-ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। আকাশ কালো, কিছুই ভাল দেখা যায় না। তাপাঙ্ক শূন্যের পনেরো-কুড়ি ডিগ্রি নীচে নেমে গেছে।

রামচন্দ্রের পরনে শুধু পাতলা কাপড়ের একটা স্যুট। শীত সে টেরই পাচ্ছে না। উপত্যকার দিকে চেয়ে সে এক অদ্ভুত সুরে শিস দিয়েই যাচ্ছে। একবার সে ক্যালকুলেটরের মতো যন্ত্রটার দিকে তাকাল। ভ্রূদুটো একটু কোঁচকাল।

উপত্যকায় নামবার কোনও পথ নেই। রামচন্দ্র রাহা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তার সামনেই গভীর খাদ। প্রায় তিন হাজার ফুট নীচে তুষারক্ষেত্র। রামচন্দ্র রাহা শিস দিতে দিতেই সেই খাদের ধারে এসে দাঁড়াল। চারদিকে একটু চেয়ে দেখল সে। তারপর লাফিয়ে পড়ল নীচে।

তিন হাজার ফুট তো সোজা নয়। রামচন্দ্র রাহার ওপর থেকে নীচে পড়তে অনেকটা সময় লাগল। পড়তে-পড়তেই সে সেই অদ্ভুত সুরে শিস দিয়ে যাচ্ছিল।

নীচে নরম তুষার। তবু তিন হাজার ফুট ওপর থেকে পড়লে যে-কোনও মানুষেরই মাঝপথেই দম আটকে মরার কথা এবং শরীরটা একদম ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। রামচন্দ্র রাহার অবশ্য কিছুই হল না। তুষারের ওপর বেড়ালের মতো হালকাভাবে নামল সে, এবং ছোট্ট যন্ত্রটায় কী একটা দেখে নিয়ে এগোতে লাগল উত্তরের দিকে। যেদিকে আরও ঘোর গহিন তুষারের রাজ্য। মস্ত উঁচু দুর্গম সব মহাপর্বত। কীটপতঙ্গ, জনমানুষ, পশুপাখি কিছু নেই। শুধু সাদা তুষারের মরুভূমি। অবিরল হুহু করে ঝোড়ো বাতাস বইছে। রাশি রাশি পাতার মতো আকাশ থেকে নেমে আসছে তুষার। এত শীত যে, রক্ত জমাট বেঁধে যায়, হাত পা অসাড় হয়ে আসে। বাতাসে অক্সিজেন এত কম যে, দম নিতে কষ্ট হয়।

শিস দিতে দিতে প্যান্টের দু পকেটে দুটো হাত ভরে রামচন্দ্র রাহা একটা গিরিশিরা বেয়ে পিছল বরফের ওপর দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। এ পথ এত সরু যে, কোনওরকমে একটা পায়ের পাতা রাখা যায়। এত খাড়া যে, বরফ কাটার কুড়ুল, পিটন এবং দড়ির অবলম্বন ছাড়া এ-পথ দিয়ে কোনও মানুষের পক্ষেই ওঠা সম্ভব নয়। ঝড়ের গতি এত বেশি যে, উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সামনেই দুটো বিশাল চেহারার তুষারশুভ্র মূর্তি। ভালুক নয়, আবার মানুষও নয়। স্থির হয়ে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের দৃষ্টিতে আদিম হিংস্রতা। বড় বড় সাদা লোমে ঢাক শরীর। কিংবদন্তীর ইয়েতি।

রামচন্দ্র রাহা এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর হাসল। ছোট্ট যন্ত্রটা বের করে সে নিজের ভাষায় বলল, "সুপ্রভাত। আমি তোমাদের দেশে একজন অচেনা বিদেশী অতিথি।"

যন্ত্রটার ভিতর দিয়ে রামচন্দ্র রাহার এই কথাগুলো কয়েকটা অচেনা শব্দ হয়ে বেরোল। কিন্তু ইয়েতি দুজন পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। অর্থাৎ তারা কথাগুলো বুঝতে পেরেছে।

রামচন্দ্র ফের জিজ্ঞেস করল, "আমি সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টা খুঁজছি। তোমরা দেখিয়ে দিতে পারো?"

ইয়েতিরা মাথা নাড়ল। দুজনেই হাত তুলে ওপরটা দেখাল। একটু অদ্ভুত শব্দ করল, "উম্‌ম্‌! উম্‌ম্‌!"

যন্ত্রের ভিতর দিয়ে রামচন্দ্র রাহা শুনল, "ঐ যে! ঐ যে!"

ইয়েতিরা পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। রামচন্দ্র রাহা পৃথিবীর সব থেকে উঁচু গিরিশৃঙ্গ এভারেস্টে উঠতে থাকে। শিস দিতে দিতে, পকেটে হাত ভরে।

* * *

দৃশ্যটা গর্ডন সাহেবের ওয়ার্কশপে বসে কাজির পর্দায় দেখতে পাচ্ছিল লাটু। সুপারম্যান, টারজান, ম্যানড্রেক সব যেন রামরাহার কাছে ছেলেমানুষ। যত সে দেখে, তত সম্মোহিত হয়ে যেতে থাকে।

কাজি প্রশ্ন করে, "রামরাহাকে কী রকম মনে হচ্ছে তোমার?"

"দারুণ।"

"ওর সঙ্গেই তোমার লড়াই কিন্তু। খ্রাচ খ্রাচের কথা ভুলে যেও না।"

এ-কথা শুনে কেন কে জানে লাটুর মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল।

কাজির পর্দায় তখন এভারেস্টে আরোহণকারী দুজন অভিযাত্রীকে দেখা যাচ্ছিল। পর্বতারোহীর পোশাক, অক্সিজেন সিলিন্ডার, কুড়ুল, পিটনে সজ্জিত দুজন মানুষ অত্যন্ত ধীর গতিতে ওপরে উঠছিল। আচমকাই প্রথমজনের বরফে গাঁথা পিটনটা খসে যাওয়ায় সে পিছলে পড়ে যেতে লাগল নীচে। নীচে মানে অনেক নীচে। কয়েক হাজার ফুট।

লাটু ভয়ে চোখ বুজে ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, "গেল গেল!"

কিন্তু না। চোখ খুলে লাটু দেখল ঠিক সময়ে কখন রামরাহা পথচ্যুত অভিযাত্রীর তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। দুটো বিশাল হাতে সে বলের মতো লুফে নিল লোকটাকে। তারপর অনায়াসে তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ফের গিরিশিরায় উঠে এসে যথাস্থানে নামিয়ে দিল। ফের পকেটে হাত ভরে এক উদাস সুরে শিস দিতে দিতে সে উঠে এল এভারেস্টের চূড়ায়।

লাটু মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখল, রামরাহা এভারেস্টের চূড়ায় উঠে আকাশের দিকে হাত বাড়াতেই তার স্যুটকেসটা কোন শূন্য থেকে ভাসতে ভাসতে নেমে এল। তিনটে ঠ্যাং বেরিয়ে এল স্যুটকেস থেকে। সেই তিন

পায়ের ওপর সেটা স্থির হয়ে দাঁড়াল। রামরাহা একটা সুইচ টিপল স্যুটকেসের গায়ে।

কাজি ফিসফিস করে বলল, "লাটু, একটুও শব্দ কোরো না। রামরাহা তার বিমার চালু করেছে! একটু শব্দ হলেও সে টের পেয়ে যাবে।"

লাটু ভয়ে দম বন্ধ করে রইল।

আচমকাই সে কাজির ভিতর থেকে রামরাহার অদ্ভুত গম্ভীর গভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

"র‍্যাডাক্যালি, আমি তোমার আবিষ্কর্তা, আমি তোমার স্রষ্টা। কেন ধরা দিচ্ছ না র‍্যাডাক্যালি? কেন আবরণী-রশ্মি দিয়ে ঢেকে রেখেছ নিজেকে? তোমার ক্ষমতা অসীম। তুমি আকাশের সমস্ত গ্রহনক্ষত্রকে কক্ষচ্যুত করে দিতে পারো, সমস্ত কসমিক প্যাটার্নকে পাল্টে দিতে পারো তুমি। এ গ্রহের নাবালকেরা তোমাকে ভুলভাবে ব্যবহার করলে কত সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে র‍্যাডাক্যালি! খ্রাচ খ্রাচ তোমাকে পেলে ব্যবহার করবে দাসত্বের কাজে। তোমার সত্যিকারের সদ্ব্যবহার জানে একটিমাত্র লোক। সে তোমার আবিষ্কর্তা এই আমি। ধরা দাও র‍্যাডাক্যালি। আর সময় নেই।"

সেই গলার স্বর শুনে লাটুর সারা শরীরের রোমকূপ শিউরে ওঠে। বুকের ভিতরটা কেমন করতে থাকে। সে হঠাৎ সব ভুলে বলে ওঠে, "কাজি! র‍্যাডাক্যালি কে?"

পর্দায় রামরাহা হঠাৎ চমকে ওঠে। তারপর খুব দ্রুত হাতে একটা নব ঘোরাতে থাকে।

কাজি হতাশ গলায় বলে, "ছিঃ, লাটু! একটু সংযম নেই তোমার! আমি ধরা পড়ে গেলাম। ওই দ্যাখো, রামরাহা তার যন্ত্র গুটিয়ে নিচ্ছে। আর উপায় নেই।"

লাটু লজ্জায় ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

কাজি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "র‍্যাডাক্যালি আমারই নাম। রামরাহা আমাকে উদ্দেশ করেই কথাগুলো বলছিল।"

খুব সংকোচের সঙ্গে লাটু জিজ্ঞাসা করে "রামরাহাই কি তোমাকে আবিষ্কার করেছিল?"

"হ্যাঁ, লাটু।"

"তবে কেন তুমি ওর কাছে ধরা দিতে চাও না? রামরাহা তো দারুণ লোক।"

"ধরা দেওয়া সম্ভব নয় লাটু। খ্রাচ খ্রাচ আমাকে প্রি-প্ল্যানড করে রেখেছে। শত হলেও আমি যন্ত্র, আমাকে যান্ত্রিক নিয়মেই চলতে হয়। আমি কারও প্রতি পক্ষপাত পোষণ করতে পারি না। প্রয়োজন হলে তোমার সাহায্যে আমি রামরাহাকে মেরে ফেলব। হয়তো সেটাই একমাত্র পন্থা।"

"মেরে ফেলবে!" লাটু খুব দুঃখের সঙ্গে বলল। তারপর অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলে, "আমার সাহায্যে কেন কাজি?"

"ওই যে বললাম, শত হলেও আমি যন্ত্র। কেউ না চালালে আমার পক্ষে চলা শক্ত। এখন একটা কাজ করো। ব্যান্ডের কাছে একটা আলপিনের মাথার মতো ছোট্ট বোতাম আছে। নখের ডগা দিয়ে সেটা খুব জোরে চেপে ধরো।"

লাটু বোতামটা খুঁজে পেয়ে নখ দিয়ে চেপে ধরল। ভিতরে ক্লিক করে একটা শব্দ হল মাত্র।

কাজি বলল, "এবার শোনো। রামরাহা আমার সন্ধান পেয়ে গেছে। কিন্তু সে তাড়াহুড়ো করবে না। তার কাছে এমন যন্ত্র আছে যার সাহায্যে সে চোখের পলকে এখানে পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু সেটা হঠকারীর

মতো কাজ হবে। সে জানে আমি আত্মরক্ষার কৌশল জানি। তা ছাড়া সে ওইসব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে তোমাদের এই গ্রহের সাংঘাতিক ক্ষতি হতে পারে। রামরাহা সুতরাং সেগুলো ব্যবহার করবে না। সে বাস, ট্রেন ইত্যাদি যানবাহন ব্যবহার করবে। এখানে আসতে আমার হিসেবে রামরাহার সময় লাগবে আরও দু'দিন। ততক্ষণে খ্রাচ খ্রাচ পৌঁছে যাবে। আমাকে রেখে দাও সামনের টেবিলে। এই দুটো দিন তুমি চুপচাপ বসে থাকো। আমাকে ভুলেও স্পর্শ কোরো না। আমার কাছেও এসো না।"

"কেন কাজি?"

"তুমি কাল সকালে দেখতে পাবে সামনের টেবিলে হুবহু আমার মতো দেখতে দুটো কাজি রয়েছে। তোমার বাঁ দিকে থাকব সত্যিকারের আমি, ডান দিকে থাকবে প্রতিবস্তুতে তৈরি আমার দোসর। রামরাহা যদি এসেই পড়ে তাহলে তুমি বাঁ দিক থেকে আসল আমাকে সাবধানে সরিয়ে নিয়ে বাইরের জঙ্গলে ফেলে দিও। খবর্দার, ডানদিকেরটায় হাত দিও না। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে। রামরাহা প্রতিবস্তুতে তৈরি আমাকে স্পর্শ করা মাত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য সেইসঙ্গে আমিও। এটাই অন্তিম উপায়।"

লাটু খুব ভয়ে ভয়ে কাজিকে টেবিলের ওপর রেখে দিল। কাজির ভিতরে বিচিত্র শব্দ উঠছিল। যেন কেউ খুব যন্ত্রণা পাচ্ছে, মর্মন্তুদ ব্যথা বেদনায় নানারকম শব্দ করছে।

এই কয়দিনে লাটু কাজিকে বড় ভালবেসে ফেলেছে। করুণ মুখে সে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে কাজি?"

"ভীষণ। মৃত্যুর আগে মানুষের এরকম যন্ত্রণা হয়।"

"কেন যন্ত্রণা হচ্ছে কাজি?"

"প্রতিবস্তুতে নিজের প্রতিকৃতি তৈরি করার মানে হল নিজের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করা। তুমি ঠিক বুঝবে না। আমার ভিতরে অণু ও পরমাণুর দুরকম চলন তৈরি হচ্ছে। একটা চলন আর-একটা চলনের ঠিক উল্টো। বড় কষ্ট।"

"রামরাহা কীরকম মানুষ কাজি?"

"সে আমার শত্রু।"

"খ্রাচ খ্রাচ কীরকম মানুষ কাজি?"

"সে আমার প্রভু।"

লাটু চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখল, টেবিলের ওপর পাশাপাশি দুটো কাজি পড়ে আছে।

হাত বাড়িয়ে বাঁ দিকের কাজিকে হাতে তুলে নেয় লাটু।

"কাজি! কেমন আছ?"

জবাব নেই।

"কাজি! কথা বলছ না কেন?"

আচমকা টেবিলের ওপর থেকে প্রতিবস্তুতে তৈরি কাজি বলে উঠল, "ও কাজি মরে গেছে লাটু। ওকে বিরক্ত কোরো না।"

লাটু সভয়ে ডানদিকের কাজির দিকে চেয়ে রইল। তারপর ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, "তুমি কি প্রতিবস্তুতে তৈরি কাজি?"

"হ্যাঁ, লাটু। আমাকে ভুলেও ছুঁয়ো না।"

"তুমি আর আগের মতো আমার বন্ধু নও?"

"না, লাটু। তবে আমি তোমার ক্ষতিও করব না। কাজি আমাকে প্রি-সেট করে রেখেছে। আমাকে না ছুঁলে তোমার ভয় নেই।"

লাটু একটু ভেবে নিয়ে বলে, "রামরাহা কি ধরতে পারবে না যে, তুমি আসল কাজি নও! তার বুদ্ধি তো সাংঘাতিক।"

"না লাটু, আমাকে স্পর্শ করার আগে আমি আসল না প্রতিবস্তু তা বোঝার কোনও উপায় নেই। আর স্পর্শ করার পর বুঝলেও লাভ নেই।"

কাজিকে দু' হাতের আঁজলায় ধরে চেয়ে থাকে লাটু। দুঃখে তার চোখে জল এসে যায়। সে কাজির দোসরের দিকে চেয়ে কান্নায় অস্ফুট স্বরে বলল, "এই কাজি কি আর কখনও বেঁচে উঠবে না?"

"আমি তা বলতে পারি না। শুধু জানি, তোমাকে বাঁচানোর জন্যই কাজি তার প্রাণ দিয়ে আমাকে তৈরি করে গেছে।"

"আমাকে বাঁচানোর জন্য?"

"হ্যাঁ, লাটু। দুই মহাশক্তিধর মানুষের লড়াই শুরু হত আগামীকাল। কাজির জন্য। সে লড়াইয়ের মাঝখানে পড়ে তোমাকে মরতে হত। কিন্তু এখন সেই সম্ভাবনা রইল না। যে প্রথমে আসবে তাকেই তুমি দান করে দিও আমাকে। আমি তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ধুলো বানিয়ে দেব। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।"

"আর তুমি?"

"ধ্বংস করা এবং ধ্বংস হওয়ার জন্যই আমার জন্ম। আমার জন্য ভেবো না। কাজিকে কবর দিয়ে এসো।"

লাটু এ-আদেশ পালন করতে পারল না। সারাদিন সে কাজির মৃতদেহ হাতে নিয়ে বসে রইল পুতুলের মতো। আস্তে আস্তে দিন গিয়ে বিকেল, তারপর সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি নামল চারধারে।

আগামী কাল সকালে আসবে রামরাহা আর খ্রাচ ব্রাচ। কিন্তু লাটুর ভয় করছিল না। এক গভীর শোকে তার বুক ভার হয়ে আছে। কাজিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে রেখে লাটু ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

খুব ভোররাত্রে আকাশে কয়েকটা অদ্ভুত চলমান উজ্জ্বল নক্ষত্রকে দেখা গেল। অতি দ্রুত তারা পশ্চিমের আকাশ থেকে ছুটে আসছিল পৃথিবীর দিকে। কয়েক সেকেন্ড পৃথিবীর সমস্ত মানমন্দিরের দূরবীক্ষণে দেখা গেল তাদের। একটা হৈচৈ পড়ে গেল। কিন্তু আচমকাই কী হল, সমস্ত আলোগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। চলমান নক্ষত্রগুলোকে আর কোথাও দেখা গেল না।

শেষ রাত্রে এক ট্রেন থামল স্টেশনে। ছ ফুট লম্বা এবং অতিকায় সুদর্শন একজন যুবক স্যুটকেস হাতে প্ল্যাটফর্মে নামল। চারদিকে একবার চেয়ে সে পকেট থেকে ক্যালকুলেটরের মতো একটা যন্ত্র বের করে কী যেন দেখল। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল গর্ডনসাহেবের বাড়ির দিকে।

* * *

কোনও শব্দ হয়নি, তবু ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল লাটুর।

চোখ চেয়ে চমকে সোজা হয়ে বসল সে। তার সামনে টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে রামরাহা। কী অসাধারণ সুপুরুষ! কী চওড়া কাঁধ! কী বিশাল দুই হাত! চোখ দুটি স্নিগ্ধ, মুখে মৃদু একটু হাসি।

লাটু তাকাতেই রামরাহা বলল, "আমার কথা বোধহয় তুমি জানো?"

"হ্যাঁ। আপনি রামরাহা।"

"আমি র‍্যাডাক্যালিকে নিয়ে যেতে এসেছি। তুমি কি অনুমতি দেবে?"

লাটুর মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছিল। রামরাহা টেবিলের ওপর রাখা প্রতিবস্তুর কাজির দিকে চেয়ে আছে। মুখখানা স্নেহসিক্ত, সেইভাবে চেয়ে থেকেই রামরাহা বলল, "বড্ড দুষ্টু যন্ত্র। কিছুতেই স্থির থাকতে চায় না। আমি ওকে নিয়ে যখন পালিয়ে আসছিলাম তখন তোমাদের গ্রহে আশ্রয় নিতে হয়। সেই সময় ও আমার মহাকাশযান থেকে ছিটকে পড়ে পালিয়ে যায়। অনেকদিন পর আজ ওর খোঁজ পেয়েছি।"

লাটু মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে। রামরাহার চেহারা সুন্দর, ব্যবহার ভাল, কিন্তু তাতে কী? ও যে কাজির শত্রু!

রামরাহা টেবিলের দিকে একটা হাত প্রসারিত করে বলে, "এর বদলে তোমাকে আমি একটা সুন্দর জিনিস দেব।"

প্রতিবস্তুর তৈরি কাজি টেবিলের ওপরে থেকেও কিন্তু টেবিলকে স্পর্শ করেনি। দুই সেন্টিমিটার ওপরে ভেসে ছিল। কেন তা লাটু জানে। পৃথিবীর বিজ্ঞান যত অনুন্নতই হোক তবু লাটু এ খবর রাখে যে, প্রতিবস্তুকে স্পর্শ করলেই অন্য যে কোনও জিনিসের অস্তিত্ব লোপ পায়। রামরাহা কি লক্ষ করছে যে, প্রতিবস্তুর তৈরি কাজি ভাসছে? না, করেনি। রামরাহার হাত এগিয়ে যাচ্ছে মারাত্মক জিনিসটার দিকে।

এখন কী করবে লাটু? রামরাহাকে তার ভীষণ ভাল লাগছে যে! সে বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলল, "ওটা ছুঁয়ো না, ওটা আমার জিনিস!"

ঠিক এই সময়ে তাদের চমকে দিয়ে হঠাৎ মাটি কেঁপে উঠল থরথর করে। র‍্যাডাক্যালির একটা অদৃশ্য বস্তু যেন ধাক্কা দিল পৃথিবীর গায়ে। ভূমিকম্প নয়, ভূমিকম্প অন্যরকম।

রামরাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে একবার ওপরের দিকে চাইল। তারপর বলল, "খ্রাচ খ্রাচ বাতাসের বুদ্বুদ ছুঁড়ে মারছে। শোনো ছোট্ট মানুষ, আর সময় নেই। খ্রাচ খ্রাচ যদি আমার নাগাল পায়, তবে লড়াই হবেই। আমাদের মধ্যে কে হারবে জানি না, কিন্তু সে-লড়াইয়ে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। অনুমতি দাও, আমি র‍্যাডাক্যালিকে নিয়ে মহাশূন্যে চলে যাই। লড়াই হলে সেখানেই হোক।"

রামরাহা কাজির দিকে ফের হাত বাড়াতেই আবার পৃথিবী দুলে উঠল প্রবল ধাক্কায়। খ্রাচ খ্রাচের বিশালকায় বাতাসি বুদ্বুদ ঘণ্টায় কয়েক হাজার মাইল বেগে এসে পড়েছিল আশেপাশে। বাইরে কুকুরগুলো মর্মন্তুদ আর্তনাদ করে ওঠে। ওয়ার্কশপের একটা ধার ভেঙে পড়ে মাটিতে। বাগানের গাছপালায় তীব্র আন্দোলন, পাখিরা প্রাণভয়ে সমস্বরে চেঁচাতে থাকে।

ইজিচেয়ার সুদ্ধু পড়ে গিয়েছিল লাটু। চারদিক ভয়ংকর জ্বলছে, তার মাথা ঘুরছে। আতঙ্কে শুকিয়ে যাচ্ছে বুক। রামরাহা তাকে তুলে দাঁড় করায়। কী জোরালো হাত, অথচ কী নরম!

রামরাহা মাটি থেকে কী একটা কুড়িয়ে নিয়ে লাটুর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বলল, "এটা কী? এই তো দেখছি র‍্যাডাক্যালি?"

লাটু হঠাৎ ডুকরে উঠে বলে, "কাজি মরে গেছে! কাজি মরে গেছে!"

রামরাহার মুখটা কেমন অদ্ভুত করুণ হয়ে যায়।

বাতাসের গোলা কোথায় দাগছে খ্রাচ খ্রাচ তা বোঝা যায় না ঠিক। তবে মাটি আরও জোরে কেঁপে ওঠে। গাছপালা ভেঙে পড়তে থাকে বাগানে। কয়েকটা কুকুর আর্তনাদ করে চিরকালের মতো চুপ করে যায়। গর্ডনের পিসি, "ও গড! ও গড!" বলে চিৎকার করে উঠোনে দৌড়াদৌড়ি করে।

রামরাহা টেবিলের প্রতিবস্তুর দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে। তারপর বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলে, "র‍্যাডাক্যালি, এভাবে আত্মহত্যা করার প্রয়োজন ছিল না তোমার।"

লাটু পড়ে গিয়েছিল ফের। উঠতে উঠতে বলল, "কাজি তোমাকে শত্রু ভাবত।"

রামরাহা মাথা নেড়ে বলল, "ভাবত না। তাকে ওরকম ভাবতে শিখিয়েছিল খ্রাচ খ্রাচ। র‍্যাডাক্যালির নৈতিক বোধ নষ্ট করেছে খ্রাচ খ্রাচ। আর কয়েকটা দিন তাকে হাতে পেলে শুধরে নিতাম।

বাইরে এক অপার্থিব বেগুনি আলোয় ভরে যাচ্ছিল চারদিক। মুহুর্মুহু বাতাসের গোলা এসে ছয়ছত্রখান করে দিয়েছে সবকিছু। ধড়াস করে ওয়ার্কশপের অনেকটা দেয়াল ধসে গেল একদিকে। উড়ুক্কু মোটর সাইকেলটা মুখ থুবড়ে পড়ে একেবারে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে গেল। টুকরো-টুকরো হয়ে গেল গর্ডনের কলের মানুষ। ঝড়ের বাক্স চৌচির। লাটু আর কাজি মিলে সম্পূর্ণ করেছিল গর্ডনের এসব খেলনা। লাটু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখল শুধু।

ঘনীভূত ও নিরেট বাতাসের আর-একটা অতিকায় গোলা পড়ল কোথায় যেন। খুব কাছে। একটা একশো মাইল বেগের ঝড় এসে বাগানের গাছপালা শিকড়সমেত উড়িয়ে নিয়ে গেল। সেইসঙ্গে উড়ে গেল ওয়ার্কশপের চাল।

লাটু আকাশের দিকে চেয়ে দেখে, তারাভরা আকাশ থেকে একটা মস্ত থালার মতো মহাকাশ-যান নেমে আসছে।

রামরাহা মৃদু স্বরে বলে, "চুপ করে থাকো, কোনও কথা বোলো না।"

"তুমি?"

"আমি! আমাকে একটু লুকিয়ে থাকতে হবে। তুমি ভয় পেও না। আমি কাছেই থাকব।"

মহাকাশযান ত্রিশ ফুট ওপরে ভাসতে লাগল স্থির হয়ে। তার তলায় একটা ছোট্ট গোল ছিদ্র দেখা দিল। কে যেন সেই ফুটো দিয়ে লাফ দিল নীচে। সোজা সে এসে নামল লাটুর সামনে।

লাটু দেখল খ্রাচ খ্রাচ। তেমনি অদ্ভুত পোশাক তার পরনে, তেমনি অদ্ভুত টুপি, আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো লম্বা মুখ! দশাসই চেহারা। একবার টেবিলের প্রতিবস্তু এবং একবার লাটুর মুখের দিকে চেয়ে সে একটু হাসল। তারপর ভারী একটা হাতে লাটুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "শাবাশ! তুমি কথা রেখেছ।"

লাটুজবাব দিতে পারল না। সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইল।

খ্রাচ খ্রাচ টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে লোভাতুর চোখে চেয়ে রইল প্রতিবস্তুর কাজির দিকে। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে লাটুর দিকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে হিংস্র গলায় বলল, "রামরাহা কোথায়? সে এখানেই ছিল। আমি তার স্পন্দন আমার সেনসরে টের পাচ্ছি। কোথায় সে?"

লাটু মাথা নেড়ে জানাল, সে জানে না, তার গলার স্বর ফুটছিল না।

খ্রাচ খ্রাচ গম্ভীর বজ্রনিনাদে বলল, "শোনো খুদে মুর্খ মানুষ, রামরাহা যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন কাজি নিরাপদ নয়। তাকে ধ্বংস করতেই হবে। যদি সত্যি কথা না বলো, তা হলে পৃথিবীকে ধ্বংস করা ছাড়া

আমার উপায় থাকবে না।”

ভয়ে লাটুর হাত পা হিম হয়ে যাচ্ছিল, সে কোনও জবাব দিতে পারল না। খ্রাচ খ্রাচ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, “রামরাহা এখনও পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারেনি, আমি জানি। কিন্তু তাঁকে খুঁজে বের করার মতো সময় আমার নেই। আমি কাজিকে নিয়ে যাচ্ছি। মহাকাশযানে ফিরে গিয়েই আমি সুপারচার্জার দিয়ে পৃথিবীকে একেবারে ধুলো করে দেব। তুমি আমার মস্ত উপকার করেছ, তবু আমার কিছু করার নেই।”

এই বলে খ্রাচ খ্রাচ হাত বাড়িয়ে প্রতিবস্তুর কাজিকে স্পর্শ করল।

লাটু কোনও মানুষকে এরকমভাবে বাতাস হয়ে যেতে দেখেনি কখনও। আজ সে চোখের পলক একবারও না ফেলে দৃশ্যটা দেখল। খ্রাচ খ্রাচ কাজিকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মস্ত শরীরটায় একটা তীব্র শিহরণ বয়ে গেল। হঠাৎ শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হল সে। তারপর অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন কয়েকটা ঘূর্ণিঝড় তার শরীরে পাক দিতে লাগল। হাত গলে গেল, পা গলে গেল, মাথা, বুক, চোখ সব যেন গলে গলে মিশে যেতে লাগল বাতাসে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপর খ্রাচ খ্রাচ এবং প্রতিবস্তুতে তৈরি কাজির কোনও চিহ্নও রইল না কোথাও।

শূন্যে ভাসমান খ্রাচ খ্রাচের মহাকাশযান কী বুঝল কে জানে। হঠাৎ একটা বেগুনি রশ্মিতে চারদিক উদ্ভাসিত করে বিদ্যুৎ-বেগে সেটা মিলিয়ে গেল আকাশে।

লাটু ক্লান্তভাবে বসে পড়ল ইজিচেয়ারটায়।

একটা কাবার্ডের আড়াল থেকে রামরাহা বেরিয়ে এল ধীর পায়ে। হাতে কাজির মৃতদেহ। মাথা নেড়ে বলল, “কাজি বেঁচে নেই। তবু আমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে ওকে আবার বাঁচিয়ে তোলার জন্য। যতদিন না পারছি, ততদিন তোমাদের গ্রহে আমাকে থেকে যেতে হবে।”

লাটু লাফিয়ে উঠল আনন্দে। “থাকবে? থাকবে রামরাহা?”

রামরাহা মাথা নেড়ে বলে, “থাকব, তবে সমুদ্রের তলায়, আমার মহাকাশযানে।”

“কিন্তু তোমাকে যে আমার দেখতে ইচ্ছে করবে!”

“ডাকলেই আমি দেখা দেব।”

“কীভাবে?”

রামরাহা একটা ঘড়ি বের করে লাটুর হাতে দিয়ে বলে, “এটা একটা সাধারণ ঘড়ি। তবে এর চাবিটা উল্টোদিকে ঘোরালেই আমি সংকেত পাব। তবে খুব প্রয়োজন ছাড়া আমাকে ডেকে না। কেমন?”

লাটু আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে মাথা নাড়ল। “আচ্ছা।”

রামরাহা সেই অদ্ভুত বিষণ্ণ সুরে শিস দিতে দিতে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘড়ি দেখে হারানচন্দ্র আঁতকে উঠে বললেন, “ও বাবা! আর ঘড়ি নয়। এ জন্মে আর ঘড়ি পরবো না আমি। ওটা তুই-ই পর! আর ঘড়ি হারাতে আমি পারব না।”

অগত্যা ঘড়িটা লাটুই পরতে থাকে।

জটাই তান্ত্রিক আর গর্ডন আবার স্বাভাবিক হয়েছেন। জটাই এসে হারানচন্দ্রকে প্রায়ই বলেন, "হুঁ হুঁ বাবা, ভূত ব্যাটার কাণ্ডটা দেখলে! সেদিন কেমন তুলকালাম ঝড়টা বইয়ে দিয়ে গেল। ওঃ, গর্ডনের কারখানাটার আর কিছু রাখেনি।"

হারানচন্দ্র খেঁকিয়ে উঠে বলেন, "ভুতুড়ে কাণ্ডটা কী রকম?"

জটাই মৃদু হেসে বলেন, "আরে চটো কেন? ভূতের স্বভাবই ওই। যখনই কিছু ছাড়তে হয়, তখনই রেগেমেগে ভাঙচুর করে যায়। তোমার ঘড়িটার ভূত হে। যেই তাড়িয়েছি, অমনি সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। তেজ ছিল খুব ব্যাটার।"

"কিন্তু ঘড়িটাও তো গায়েব! সেটার কী হল?"

হরি ডোমের করোটিতে চা খেতে খেতে জটাই গম্ভীর মুখে বলেন, "ঈশ্বরে মন দাও হারান, ঈশ্বরে মন দাও। 'কালী কালী' বলে দিনরাত ডাকো। বিষয়-চিন্তা করে করে যে একেবারে হয়রান হয়ে গেলে!"